প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম।

৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত

এবং

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা, সাহিত্য-যন্ত্রে

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত এবং

৫৫, অপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ

কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

বৈশাখ, ১৮১৯ শক।

মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র

ভ্রমসংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	৪	বহ্নিমান্	বহ্নিমান
৪৪	৫	isolated	insulated
৭৪	২	নিয়মানুসারো	নিয়মানুসারে
ঐ	৬	দ্বার	দ্বারা
৮৮	৫	চঞ্চল, সংকোচ্য	চঞ্চল
৯২	৩	দ্রুভতানুসারে	দ্রুততানুসারে
৯৬	১৩	আলোক	আলোকের

প্রকাশকের নিবেদন।

পরলোকগত পূজ্যপাদ পিতৃদেব এই পুস্তকখানি চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিপি গ্রন্থের প্রারম্ভেই "৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৫ শক, বৃহস্পতিবার" এইরূপ লিখিত হইয়া গ্রন্থ রচনার সময় স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট করিতেছে। এই সময়ে পিতৃদেব আরও কয়েকখানি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলিও হস্তলিপিতেই রহিয়াছে। আমরা অবসরমত সেগুলি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই পুস্তকের সম্পাদনভার আমরা বিজ্ঞানপারদর্শী পরম সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহোদয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনি যেরূপ সদাশয়তা ও যত্নের সহিত এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণপাশে আবদ্ধ রহিলাম বলিলেও আমাদের অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা সুব্যক্ত হয় না।

সর্ব্বোপরি যে মঙ্গলময় দেবদেবের আশীর্ব্বাদে নানা বাধা বিঘ্ন অপসারিত হইয়া গিয়াছে, গ্রন্থারম্ভে তাঁহাকেই নমস্কার করিয়া গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতেছি। ইহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই মহিমা ধ্বনিত করিতে থাকুক।

যোড়াসাঁকো, কলিকাতা
বৈশাখ, ১৮১৯ শক।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মুখবন্ধ।

স্বর্গীয় মহোদয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজ্ঞান শাস্ত্রের অবশ্যজ্ঞাতব্য স্থূল কথাগুলি অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে কতকগুলি এই গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বয়ং ইহা প্রকাশ করিলে অনেক স্থলে হয় ত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিতেন। স্বর্গীয় মহোদয়ের কৃতী পুত্র আমার পরমশ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই রচনাগুলির সাহিত্যমধ্যে স্থায়িত্ব-প্রদান বাঞ্ছা করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং আমার প্রতি সানুগ্রহ শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া রচনাগুলির সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে সেই ক্ষমতার প্রয়োগে আমাকে বিশেষ সংকোচ বোধ করিতে হইয়াছে। একটা কারণ, পরলোকগত লেখকের রচনায় হস্তক্ষেপে অপরের কতটা অধিকার আছে, তাহার নিরূপণ দুরূহ। আর একটা কারণ, আমার কৃত কার্য্যের বা অকার্য্যের জন্য পাঠক হয় ত লেখককে দায়ী করিতে পারেন, এই আশঙ্কা। এরূপ স্থলে দায়িত্ব বড় গুরুতর; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাকে সে বিপদে পড়িতে হয় নাই। কেননা প্রায় সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই পুস্তক প্রকাশিত হইল; সংশোধনের বা পরিবর্ত্তনের অধিক প্রয়োজন দেখিলাম না।

পুস্তকের ভাষা বোধ হয় পাঠকের নিকট স্থানে স্থানে জটিল ও দুর্ব্বোধ মনে হইবে। কিন্তু তজ্জন্য রচনার দোষ দেওয়া চলিবে না। বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগী হয় নাই; বিজ্ঞানের বাঙ্গালা এখনও গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভাষার অভাবে এখনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিতে কেহ সাহস করেন না। লিখিলেই রচনা অপাঠ্য ও অবোধ্য হইয়া উঠে। এই গ্রন্থে তাড়িতবিজ্ঞান শব্দবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখার সম্বন্ধে প্রস্তাব আছে। এই গ্রন্থের রচনার পূর্ব্বে বোধ হয় এই সকল বিষয়ে কেহ কোন কথা লেখেন নাই, অদ্যাপি সম্যক্ চেষ্টা হইয়াছে বোধ হয় না। এই গ্রন্থের রচয়িতা এত অসুবিধা সত্ত্বেও বাঙ্গালাভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিতে সাহসী ও উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণবদ্ধ থাকিবে।

আর একটু বিস্তৃত করিয়া লিখিলে বোধ হয় সাধারণ পাঠকের ও প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধা হইত। গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থ প্রকাশের অবসর পাইলে বোধ হয় এ বিষয়ে বিবেচনা করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তজ্জন্য পরিতাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

আমি সাধারণতঃ গ্রন্থের ভাষার উপরে হস্তক্ষেপে সাহসী হই নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র সাধারণের সম্পত্তি; কিন্তু ভাষা ও

রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র লেখকের নিজস্ব সম্পত্তি। বিশেষতঃ লেখক যেখানে সমালোচনার স্পর্শের অতীত, সেখানে তাঁহার নিজস্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপে অনধিকার চর্চ্চা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়।

এই কারণে দুই চারিটা শব্দ বা দুই চারিটা বাক্যমাত্র ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের পরিবর্ত্তনে কিছু অধিক মাত্রায় স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছি। গ্রন্থকার বিবিধ বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দ সংকলনে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার স্বরচিত অনেক শব্দ এই গ্রন্থে দেখা যাইবে। ইহার মধ্যে অনেকে ভাষায় স্থায়িত্ব লাভ করিবে আশা করি। তাঁহার রচিত ও ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ বদলাইয়া তাহার স্থানে এখনকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে প্রচলিত শব্দ দেওয়া গিয়াছে। রাসায়নিক অংশে গ্রন্থকারের রচিত পারিভাষিক শব্দ ব্যতীত আরও কতকগুলি নূতন শব্দ আমাকে বসাইতে হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে "সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায়" আমি রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম। ক্ষিতীন্দ্র বাবু ও তাঁহার আত্মীয়বর্গ ঐ প্রস্তাবের প্রতি কতকটা পক্ষপাত দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মতিক্রমে এমন কি অনুরোধক্রমে, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমার রচিত কতকগুলি রসায়ন সংক্রান্ত পারি-

ভাষিক শব্দ এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। সেই শব্দগুলির উপযোগিতা সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা দায়ী হইবেন না। পঙ্‌ক্তিভাষায় ঐ শব্দগুলি তারকাচিহ্নিত করিয়া দেওয়া গেল।

গ্রন্থের আকার ক্ষুদ্র, কিন্তু বিষয় বিস্তৃত। এতগুলি বিষয় এত সঙ্কীর্ণ স্থানে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত বিবৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্রুত উন্নতিশীল; এমন কি উহার মূল সত্য গুলিরও আকার এই কয় বৎসরে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থরচনার সময় যে আকার ছিল, এখন তাহা নাই। শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের শেষ কথা শুনানই ব্যবস্থা। সেই অনুরোধে স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন, স্থানে স্থানে ফুটনোট যোগ, করিয়া দিতে হইয়াছে। অঙ্ক ও সংখ্যা সম্বন্ধে যেখানে স্থূল জ্ঞানই যথেষ্ট, সেখানে সূক্ষ্ম হিসাব দিবার চেষ্টা করা যায় নাই।

পুস্তক ক্ষুদ্র ও প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য লিখিত হইলেও ইহার বর্ণনাপ্রণালীতে একটু অসাধারণত্ব আছে। ওস্তাদের হাত অতি সামান্য কাজেও ধরা পড়ে। জ্ঞানের আহরণে লাভ আছে, কিন্তু জ্ঞানাহরণের প্রকৃষ্ট পন্থা দেখাইতে পারিলে ও সেই পন্থায় চলিতে পারিলে আরও লাভ। জ্ঞান আহরণ অনেকেই করিতে পারেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সকলে চলিতে পারেন না; আপনার সমগ্র চিন্তাপ্রণালীকে

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহিত সঙ্গত করিয়া তোলা সকলের সাধ্য নহে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রন্থকারের আয়ত্ত ছিল, তাহার পরিচয় এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ মধ্যেও যথেষ্ট পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ জড়পদার্থের গঠন এবং অণু ও পরমাণুর সম্বন্ধ বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে পারি। এই সকল স্থানে ওস্তাদী হাতের পরিচয়; সকল হাতে এমনটুকু বাহির হয় না। এই খানে গ্রন্থকারের অসামান্যত্ব; অথবা বঙ্গের যে অসামান্য গৃহস্থ পরিবারকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া গ্রন্থকার অকালে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে ইহাতে বিস্ময়ের কথা কি? বঙ্গসাহিত্যের প্রায় সমগ্র অংশ এই অসামান্য পরিবারের নিকট অশেষ বিষয়ে ঋণগ্রস্ত। আক্ষেপ যে, বাঙ্গালার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যও অধিকতর ঋণস্বীকারে অবসর পাইল না।

স্বর্গীয় মহোদয় বাঙ্গালীর জন্য বিজ্ঞানপ্রচারে অন্যতম পথপ্রদর্শক। বাঙ্গালী বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতির নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই অবসর পাইয়া আমি কৃতার্থ ও ধন্য হইয়াছি।

চৈত্র, ১৮১৮ শক
কলিকাতা; } শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সূচীপত্র।

শব্দ বিজ্ঞান

আলোক

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম।

প্রাকৃতিক ঘটনা ও তাহার কারণ।

চতুর্দ্দিকে স্বভাবের যে সকল ঘটনা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়, এবং যে সকল কারণ হইতে সেই সকল ঘটনা উৎপন্ন হয়, তাহার শিক্ষাদানই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।

যে সকল কারণ সামান্যতঃ সকল বস্তুরই উপর কার্য্য করে, এবং যাহারা তাহাদিগের বস্তুগত বা দ্রব্যগত ভাব পরিবর্ত্তন না করিয়াও অবস্থান্তর প্রাপিত করে, ইহা কেবল সেই সকল সাধারণ কারণ লইয়াই থাকে।

এই সকল কারণ অল্পসংখ্যক মাত্র। ইহাদিগকে নিম্নরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে ; যথা,—ভার, তাপ, আণবিক ক্রিয়া, চৌম্বক, তাড়িত, তাড়িত-চৌম্বক, শব্দ এবং আলোক। আবার এই এক এক

নামে এক এক বড় বড় বিজ্ঞান-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

এখন এই সমস্ত বিভাগকে কতক কতক দৃষ্টান্তের দ্বারা সঙ্ক্ষেপে একে একে বিবৃত করিবার চেষ্টা করি; তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, কত কত ঘটনা-শ্রেণী ইহার এক এক বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

ভার।

ভার কি। যে বল সকল দ্রব্যকেই পৃথ্বীতলে নিক্ষেপ করে, তাহাকেই ভার বলে। সকল বস্তুই ভূমিতে পড়ে, যদি তাহারা বিধৃত না হয়, (যদি তাহাদিগকে কেহ ধরিয়া না রাখে)। এই ঘটনাটী এমনি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী যে, কেহ ভাবেও না যে ইহা কেন হয়—কেহ আপনার নিকট হইতে ইহার হিসাব চাহে না। কিন্তু যখন পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে পড়ে; যখন বৃষ্টি, তুষারশিলা মেঘের ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপতিত হয়, তাহারা তখন নিজের স্বাভাবিক

ক্রিয়া দ্বারা আপনাদিগকে স্থানান্তরে চালায় না।
তাহারা প্রাণীও নহে, উদ্ভিদও নহে, কিন্তু অন্যান্য
নিরিন্দ্রিয় পদার্থের ন্যায় জড়ত্বগুণোপেত জড় পদার্থ
মাত্র; অর্থাৎ, না তাহারা আপনাকে আপনি গতি
দিতে পারে, না অন্যের নিকট হইতে যে গতি পায়,
তাহাকে কোনরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে,—না
তাহাকে কমাইতে পারে, না তাহাকে বাড়াইতে পারে।
অতএব অন্য কোন কারণ বা বল আছে, যাহার
ক্রিয়াযোগে তাহারা চালিত ও পতিত হয়। জড়
পদার্থমাত্র এই বলের অধীন—ইহাকে ভার বলে।
"বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি বলেনান্তরীক্ষং।"*

ভারের অভিমুখতা। যে সকল দ্রব্য বিধৃত হয়, তাহারা
পড়ে না, কিন্তু পতনোন্মুখ থাকে; যখন আমরা কোন
বোঝা লই তখন আমরা তাহা পরীক্ষাতেই জানিতে
পারি,—কেন না আমরা জানিতে পারি যে নিরন্তর
চেষ্টা দ্বারা ঐ বোঝা বিধৃত হইতেছে। ওলন-যন্ত্রের

---

* ছান্দোগ্যোপনিষদ।

সূত্রের আগায় যে সীসকখণ্ড ঝুলান যায়, তাহা সর্ব্বদাই পতনাবনত থাকে, এই জন্য তাহা সূত্রকে টানিয়া রাখে, এবং সূতা যদি অশক্ত বা কম-জোর হয়, অথবা সীসা যদি অধিক ভারী হয়, তাহা হইলে সূত্র ছিঁড়িবার আশঙ্কা থাকে। ওলন যে মুখে লক্ষ্য করে, ভারের মুখও সেই দিকে; কারণ যত ক্ষণ সেই বল, যাহা ওলনকে টানিতেছে, ঠিক সূতার লম্বতানুসারে না পড়ে, লম্বতার দিকে না উপলক্ষিত হয়, ততক্ষণ ঐ ওলন-যন্ত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। ওলনের এইরূপ অভিমুখতাকে লোকে ঐ স্থানের সম্বন্ধে সোজা বা খাড়া হইয়া উঠা কহে। স্থির জলের সম্বন্ধে ঊহা সর্ব্বদাই খাড়া, এবং ঐ জল নিজে উহার সম্বন্ধে সমঢালবর্ত্তী বা চক্রবাড়দিগ্‌বর্ত্তী।

পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, কি উচ্চতম পর্ব্বতশিখরে, কি নিম্নতম খনির গভীরে, জলে কি স্থলে, গ্রীষ্মপ্রদেশে কি মেরুসন্নিহিত স্থানে, পৃথ্বী-মণ্ডলের সকল দিকেই এই ভারক্রিয়ার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

পৃথিবীর গোলত্ব বশতঃ, উহার বিভিন্ন স্থানস্থিত ওলন আপন আপন স্থানের প্রতি সোজা হইয়া দাঁড়াইলেই, তাহারা সকলেই পৃথিবীর মধ্যবিন্দুর প্রতি অবলোকন করে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সমগোলঢাল, সুতরাং ওলন সকল যখন বিভিন্ন স্থানের প্রতি সোজা হইয়া দাঁড়ায়, তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধে সমান্তরাল রেখায় দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু হেলিয়া হেলিয়া দাঁড়ায়।
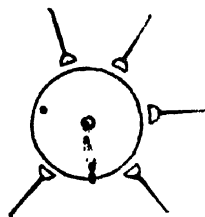
১ম চিত্র।

ভারের প্রভাব। ওলনের সীসা যে সূতার উপর ঝুলিয়া থাকে, তাহা যেমন সেই সূতাকে সোজা টানে, সেইরূপ যখন কোন দ্রব্য সমঢালের উপর থাকে, তখন সেই দ্রব্য তাহার আধারের প্রতি সোজা ভর দেয়। যখন কোন দ্রব্য পর্ব্বতের গড়ান প্রদেশের ন্যায় কোন ঢালুর উপর থাকে, তখনও সেই ঢালুস্থানের প্রতি তাহার চাপ সোজারূপে পড়ে। এই জন্য কোন ঠেকা বা ঘর্ষণ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ না হইলে উহা গড়াইতে গড়াইতে বা সরিতে সরিতে নীচে পড়িয়া যায়। এইরূপে প্রস্তরখণ্ড

সকল গড়াইতে গড়াইতে উপত্যকায় পড়ে; পর্ব্বতের চেক্‌ণা মাটি যখন বৃষ্টিতে ভিজিয়া নরম হয় এবং তাহার ঘর্ষণের শক্তি কম হয়, তখন তদুপরিস্থ স্তরের উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকারাশি খসিয়া পড়ে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষার-চাপ পর্ব্বতের উপর প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পড়িতে যে বেগ ধারণ করে, সেই বেগ দ্বারা বাড়ী গাছ পালা সম্মুখে যাহা কিছু পড়ে, সব একেবারে চুরমার করিয়া চলিয়া যায়।

জল যে স্রোত বহিয়া যায়, তাহারও ঐ কারণ। যখন বৃহদায়তন নদী সকল অপরাপর নদনদী ও বেগবান্ প্রবাহ উৎসাদি প্রাপ্ত হইয়া গম্ভীর স্রোতে তাহাদিগের জলকে সমুদ্রাভিমুখে বহন করিতে থাকে, তখন তাহারা ভারের আদেশকেই শিরোধার্য্য করে; এই বলই তাহাদিগকে প্রোৎসাহিত করে, সঞ্জীবিত করে। ইহাই তাহাদিগের উপর আরোহী হইয়া, কখনো বা অত্যন্ত গড়ান প্রদেশে দ্রুতবেগে, কখনো বা অল্প-গড়ান দেশে ধীরে ধীরে চালাইয়া লইয়া যায়। কি ভূমিতলে, কি বৃহদায়তন সমুদ্রমাঝারে, এমন এক

ফোঁটা জল দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা এক মিনি-
টের জন্য ভারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে।
এমন একটী পরমাণু নাই, যাহাকে ইহা পরিত্যাগ করে;
কোন পরমাণুকে নিরাশ্রয় দেখিলে ইহা তাহাকে
পড়িতে আহ্বান করে, এবং যদি তাহা কিছুতে আশ্রয়
করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ভারেরই আদেশে সেই
পরমাণু তাহার আশ্রয়কে চাপিতে থাকে।

ক্ষুদ্রের কথা দূরে থাক্, পর্ব্বতেরাও নিম্নে পতনো-
ন্মুখ। ভীষণ ভূমিকম্পনে, আগ্নেয়গিরির প্রবল অগ্ন্যুৎ-
পাতে, যে সকল ক্ষণিক বলক্রিয়া পৃথিবীকে কম্পিত,
চালিত ও বিদারিত করিয়া ভূমধ্য হইতে ভূধর ও
কঠিন প্রস্তররাশি ঊর্দ্ধে আকাশমুখে প্রক্ষেপ করে,
ভার চিরস্থায়ী বলরূপে অটলভাবে কার্য্য করিয়া
অবশেষে ঐ সকল ক্ষণিক বলের উপর জয়লাভ করে;
যেই উহাদিগের ক্ষণিক ক্রিয়া অবসন্ন হইয়া গেল,
তখন, যে ভার এতক্ষণ উৎক্ষিপ্ত পদার্থের কাহাকেও
পরিত্যাগ করে নাই, সেই ভার প্রকাশ্যরূপে ও এক-
মাত্র অধিপতিরূপে, ঈশ্বরপ্রদত্ত নিয়মানুসারে, তাহা-

দিগকে ভূমিমুখে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগের দ্বারা এক নূতন সমতা বিধান করে।

তাপ।

তাপের পরিচয়। তাপ নানা উপায় দ্বারা আপনাকে প্রকাশিত করে। এক, যে উষ্ণতা আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য হয়; দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যের মধ্যে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটায়, এই উভয়ের দ্বারাই আমরা তাপের পরিচয় পাই।

আমরা নিজেই পদার্থ বিশেষে বিভিন্ন পরিমাণে উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকি। আমরা বলি যে, এই বস্তুটী ঠাণ্ডা বা গরম, বড় ঠাণ্ডা বা বড় গরম, ঈষৎ ঠাণ্ডা বা ঈষৎ গরম। আবার ইহাও আমরা জানি যে, ঐ বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়বোধের যে কারণ, তাহা সেই দ্রব্য হইতে ভিন্ন—কেন না আমরা সহজেই সেই একই দ্রব্যকে ঐ সকল অবস্থায় লইয়া যাইতে পারি।

অতএব, তাপ দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র; তাপ যখন

দ্রব্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনি তাহা গরম বা অত্যন্ত গরম বা আগুণের মত গরম বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। আবার যখন তাপ দ্রব্য হইতে বহির্গত হয়, তখন আমরা তাহাকে কম গরম, কুসুম গরম, ঠাণ্ডা, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বিপর্য্যয় ঠাণ্ডা বলি।

বায়ুই যে কেবল এইরূপ তাপ আহরণ ও বিসর্জ্জন করিতে পারে, কখনও বা উষ্ণ, কখনও বা শীতল হয়, তাহা নহে; জল ও জলীয় পদার্থেরই যে কেবল এই-রূপ ভাব, তাহাও নহে; যে সকল পদার্থ অত্যন্ত কঠিন ও প্রতিঘাতকারী এবং অত্যন্ত নীরেট, যেমন লৌহ, ইস্পাৎ, হীরক প্রভৃতি, তাহারাও পুনঃপুনঃ গরম ও শীতল হয়। তাপ দ্রব্যমাত্রেরই মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে ও সেই দ্রব্যের উষ্ণতা সাধন করে এবং তাহা হইতে বাহিরে অল্পে অল্পে প্রসৃত হইয়া আবার সন্নিহিত পদার্থ সকলকে তাহাদের পালায় গরম করিয়া তুলে।

এই তাপ ভারজনক পদার্থ নহে, কারণ যখন ইহা কোন পদার্থের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, তখন ইহা দ্বারা

তাঁহার ভারের কোন বেশীকম তারতম্য হয় না। অণু-

তাপের স্বরূপ। সমূহের বিকম্পনেই তাপের উৎপত্তি হয়। তাপ পদার্থ নহে, উহা গতি হইতে উৎপন্ন; বিকম্পনক্রিয়াবশতই কোন দ্রব্য কখনো গরম বোধ হয়, কখনো বা ঠাণ্ডা বোধ হয়। যদি কোন দ্রব্যে বিকম্পন অধিক পরিমাণে, অধিক বেগে, এবং শীঘ্র শীঘ্র হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য অধিক তপ্ত হইল; যদি বিকম্পনক্রিয়া অল্পপরিমাণে ও অল্প বেগে, এবং ধীরে ধীরে হয়, তাহা হইলে তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা ঠাণ্ডা হইল।

উষ্ণতা। দ্রব্যমধ্যে তাপের পরিমাণের ইতর বিশেষে ঐ দ্রব্যের উষ্ণতার ইতর বিশেষ হয়। এই উষ্ণতা আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের গোচর।

তাপমান যন্ত্র। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা উষ্ণতার পরিমাণ একরূপ মোটামুটি বুঝিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূক্ষ্ম পরিমাণ পাওয়া যায় না। অতএব, সেই ভ্রম নিরাকরণ পূর্ব্বক উষ্ণতাংশ ঠিক করিয়া নিরূপণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার তাপমান যন্ত্র (Thermometer) প্রস্তুত হইয়াছে।

বহ্নিমান যন্ত্র। যে তাপমান যন্ত্র অগ্নির বা অগ্নি শিখার কিম্বা হল্কার অথবা সাধারণ্যে কোন জ্বলন্ত পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণ করে, তাহাকে তাপমান যন্ত্র না বলিয়া বহ্নিমান্ যন্ত্র (Pyrometer,) বলে।

তাপের কার্য্য। প্রায় সকল পদার্থই উষ্ণ হইলে বিস্তৃত হয়, এবং শীতল হইলে সঙ্কুচিত হয়, এবং সচরাচর সেই পূর্ব্ব উষ্ণতায় আসিলে, সেই পূর্ব্ব আয়তনই প্রাপ্ত হয়।

কঠিন পদার্থের উপর উষ্ণতার এই ফল দেখাইবার জন্য ধাতবীয় দণ্ডবিশিষ্ট একটী যন্ত্র চাই। ঐ যন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল একটী মোটা তক্তার দুই দিকে ধাতুর দুইটি হাতা পোতা আছে। বায়ুর সাধারণ উত্তাপে ঐ দণ্ড ঠিক ঐ হাতাদ্বয়ের ভিতর প্রবেশ করে; কিন্তু দণ্ডকে একটু তাতাইলে আর সে উহার ভিতরে
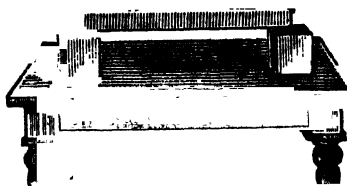
২য় চিত্র।

প্রবেশ করিতে পারে না; ক্রমে যখন শীতল হইয়া তাহা পূর্ব্ব উষ্ণতায় আসে, তখন অতিরিক্তায়তন আপনাপনি খর্ব্ব হইতে হইতে তাহা স্বয়ংই হাতার ভিতর পড়িয়া যায়।

বহ্নিমান যন্ত্র দ্বারা বিস্তৃতি নিরূপণ।

নিম্নলিখিতরূপ বহ্নিমান যন্ত্র দ্বারা সংকোচ, বিস্তার এবং পূর্ব্বায়তন প্রাপ্ত হওয়ারূপ ঘটনাত্রয়কে বিস্তারিতরূপে প্রত্যক্ষ-
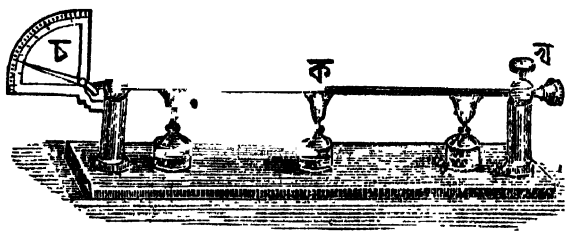
৩য় চিত্র।

গোচর করান যাইতে পারে। ক ধাতুময় দণ্ড, যাহার উপর পরীক্ষা চলিতেছে; উহাকে নিম্নস্থ জ্বলন্ত বারুণী (Alcohol) শিখা দ্বারা গরম করা যাইতেছে। ইহার এক মুখ ঘূর্ণিদণ্ড খ-তে দৃঢ়রূপে লাগান আছে; আর এক মুখ চ কাঁটাতে লাগিয়া আছে। এখন ধাতুময়

দণ্ড ক-কে উত্তপ্ত করিলেই, তাহা বিস্তৃত হইয়া এই শেষমুখে‍চ কাঁটাকে ঠেলিতে থাকিবে, এবং সেই কাঁটা পরিমাপক যন্ত্রের (Quadrant) উপর চলিয়া ধাতু-দণ্ডের বিস্তৃতি নির্দ্দেশ করিবে।

তরল পদার্থের বিস্তৃতিপরীক্ষা।

তরল পদার্থের, যেমন জলের, কি তৈলের, কি বারুণীর, কি পারার বিস্তৃতি দেখাইবার জন্য একটা কাচের পাত্রের মুখে একটা সরু ছিদ্রবিশিষ্ট কাচের নল জোড়া দিতে হয়; পরে সেই নলের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত তরল পদার্থে পূরিয়া তাহাকে একবার গরম জলে, একবার ঠাণ্ডা জলে চুবাইলে দেখা যাইবে যে, গরম জলে চুবাইবার সময় নলের ভিতরের তরল পদার্থের স্তম্ভ ধীরে ধীরে কতকদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়া থাকিবে; আবার ঠাণ্ডাজলে চুবাইবার সময় উহা কতকদূর পর্য্যন্ত নামিয়া স্থিরভাবে থাকিবে; আবার যদি উহাকে বাতাসে খানিকক্ষণ রাখিয়া ভিতরের

৪র্থ চিত্র।

'তরল পদার্থের উষ্ণতাকে চতুর্দ্দিকের উত্তাপের সমান করিয়া আনা যায়, তাহা হইলে ঐ তরল-পদার্থের স্তম্ভ পুনরায় আপনার সর্ব্বপ্রথমস্থিত তলে আসিয়া দাঁড়ায়। এমতে তরল পদার্থের আয়তন দ্বারাই তাহার উষ্ণতা নির্দ্দিষ্ট হয়।

বায়ুর বিস্তৃতিপরীক্ষা। বায়ুর বিস্তৃতি দেখাইবার জন্য একটা বড় কাচের কুজা চাই; তাহার মুখে দুই সমতল ক্ষুদ্র ফানস বিশিষ্ট দোফেরা নল এমনি ভাবে বসাইতে হইবে যে, আশপাশ হইতে বায়ু না যাইতে পারে। ঐ দুই খ ও গ ফানসের নীচের অর্দ্ধেক ভাগ জলপূর্ণ করিয়া ভিতরের বাতাসকে বাহিরের বাতাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে। এখন যদি ক কুজার ফানসকে মদিরাসব (Spirit) প্রদীপ দ্বারা উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তন্মধ্যস্থ বায়ু প্রসারিত হইয়া বক্র নলের জলের উপর চাপ প্রয়োগ করিয়া প্রথম খ ফানসের জলকে দ্বিতীয় গ ফানসে উঠাইয়া দিয়া ভিতর হইতে বুদ্‌বুদাকারে বাহির হইতে থাকে। উত্তাপ দিতে ক্ষান্ত হইলে কুজার ক ফানস যখন

শীতল হয়, ভিতরের বাতাসের চাপ তখন কম হইয়া পড়ে—বাহিরের বাতাসের সঙ্গে তাহার চাপ সমান থাকে না; সুতরাং বাহিরের বাতাস নলের দ্বিতীয় গ ফানসের জলকে বেগে হঠাইয়া প্রথম খ ফানসে আনিয়া ফেলে, এবং তথা হইতে বাতাস বুদ্‌বুদাকারে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের বাতাসের সঙ্গে চাপ সমান করিয়া পূর্ব্ববৎ কুজাকে পূর্ণ করে। এই পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে, বাতাসের বিস্তৃতি বা প্রসার তরল বা কঠিন পদার্থ হইতে অনেক অধিক।
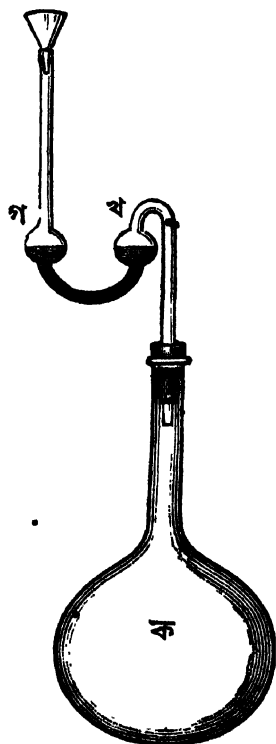
৫ম চিত্র।

সুতরাং যখন সকল পদার্থ দিনের বেলায় সূর্য্য-

তাপে গরম হয় এবং রাত্রিকালে ঠাণ্ডা হয়, তখন বলিতে হইবে, সকল পদার্থেরই আয়তনের নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে সকল পদার্থ অত্যন্ত প্রতিযোগী ভাবেও লাগিয়া থাকে, যেমন বাষ্পীয় শকটের লৌহবর্ত্ম সকল, ঝোলা সাঁকোর শিকল সকল, নির্ম্মিত বাটীর ইষ্টক প্রস্তরাদি, ইহাদের কাহারই আয়তন ধ্রুবনির্দ্দিষ্ট নাই ; কঠিনতর নির্ম্মিত উচ্চ প্রাসাদও এইরূপ পরিবর্ত্তনের হস্ত হইতে মুক্ত নহে—বায়ুর উষ্ণশীততানুসারে তাহাও হয় দীর্ঘ হইতেছে, নয় হ্রস্ব হইতেছে ; হয় উচ্চ হইতেছে, নয় নীচু হইতেছে।

তাপে পদার্থের অবস্থা-পরিবর্ত্তন।

তাপ পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তন করে ; ইহাই কঠিনকে তরল এবং তরলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে সক্ষম। সমস্ত জগৎ তাপের এই সকল কার্য্য অবগত আছে। সকলেই জানে যে, তাপই বরফ, মোম, গন্ধক, সীসা, পিতল, রূপা, সোনা, এই সকলকেই গলাইয়া দেয় ; আবার সেই সকল ঠাণ্ডা হইলে অথবা তাহাদের উষ্ণতার কতক হ্রাস হইলে

তাহারাই পুনরায় কঠিন হয়। কিন্তু তরল অবস্থা হইতে বাষ্পীয় অবস্থায় যাওয়ার বিষয়ে সকলে মনোযোগ দেয় না বলিয়া তাহার তত্ত্ব অত সূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারে না। কেহই সন্দেহ করে না যে, এক সের বরফ হইতে এক সের জলই হয়; এক সের থান সোনা গলাইলে এক সের গলা সোনা পাওয়া যায়। যখন জলের বলক উঠিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইতে হইতে ক্রমে জল অদৃশ্য হইতে থাকে, তখন সন্দেহ হইতে পারে যে এক সের জল হইতে এক সেরই বাষ্প উদ্গত হয় কি না—যেহেতু অনেকে জানে না যে, বাষ্পটা কি। বাষ্প হইতে যে জল হয় তাহা অনেকে জানে; কিন্তু বাষ্পের যে কি প্রকার সত্তা, উহা যে কিরূপে অবস্থিতি করে, এ বিষয় অনেকের অপরিজ্ঞাত।

বাষ্প। গরম জলের উপর দিয়া ধোঁয়ার মত বা কুয়াসার মত যাহা বাহির হয়, তাহা বাস্তবিক বাষ্প বা ভাপ নহে; তাহা জমা বাষ্প, অর্থাৎ বাষ্প ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র জলকণারূপে, এক ইঞ্চির ৫০০

ভাগ হইতে ২৫০ ভাগের এক ভাগ অবধি বিস্তৃত হইয়া সূক্ষ্ম কণার আকারে পরিণত হইয়া চক্ষুগোচর হয়; কিন্তু যাহা আসল বাষ্প, যাহাকে স্থিতিস্থাপক বা সূক্ষ্ম বাষ্প বলিয়া ঘনীভূত বাষ্প হইতে পৃথক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা বাতাসেরই ন্যায় স্বচ্ছ এবং অদৃশ্য।

বাষ্পের শক্তি। এক সের জলকে বাষ্প করিলে সূক্ষ্ম বাষ্প এক সেরই হয়। ইহাতে জলের বস্তুতঃ পরিবর্ত্তন হয় না, কেবল আকারগত ভেদ বা অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় মাত্র। বাষ্পের আয়তন-পরিমাণ জল অপেক্ষা অনেক বেশী, সচরাচর সার্দ্ধসহস্রাধিক গুণ বেশী। স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রসারণী শক্তি বাষ্পের বিশেষ লক্ষণ; উহা নিরন্তর অধিকাধিক স্থান ব্যাপিবার জন্য চেষ্টা করে; উষ্ণতা বাড়িলে অথবা চাপ কমিলে উহার আয়তন বাড়িয়া যায়। এই বলকে উপযুক্তরূপে নিয়মিত করিলে ইহা বাষ্পীয় কলের চোঙার দণ্ডকে ঠেলিতে সমর্থ হয়; ইহাই বাষ্পীয় শকট ও তাহার সঙ্গে যাত্রী ও বোঝাই গাড়ি টানিয়া লইয়া চলে;

ইহা লক্ষ লক্ষ মণ বোঝাই জাহাজ সকলকে সমুদ্রবক্ষ বিদারণ করিয়া লইয়া যায়; ইহা গুলিগোলা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়; ইহা জল গরম করিবার পাত্র সকল বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের বৃহৎ বৃহৎ ভগ্নাংশ সকলকে ঘোরবেগে অতি দূরে প্রক্ষেপ করিতে পারে।

প্যাপ্যাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্র।

প্যাপ্যাঁ (Papin) নামক ব্যক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত জল গরম করিবার কল দ্বারা এই বলের ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা একটি পুরু পিতলের পাত্র; ইহার দুই-তৃতীয় ভাগ জলে পূর্ণ করিয়া ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বন্ধ করিতে হয়। যখন ঐ জল উপযুক্ত
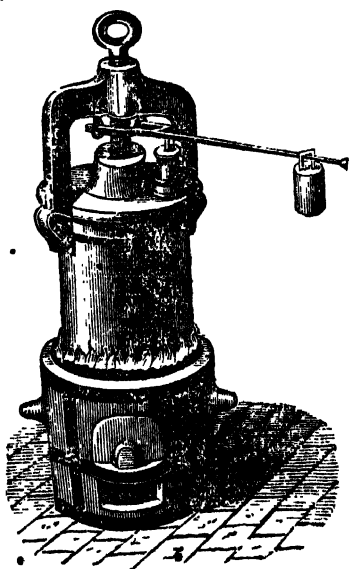
৬ষ্ঠ চিত্র।

পরিমাণে গরম হইল, তখন ছিপি খুলিয়া দিলে তাহা হইতে বেগে বাষ্পনির্গমন হেতু শীষের ন্যায় এমনি এক ভয়ানক শব্দ নির্গত হয় যে কানে তালা ধরিয়া যায়; সেই সঙ্গে কুয়াসার ন্যায় ঘনীভূত বাষ্পকে অনেক ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত উচ্চ স্তম্ভাকারে উত্থিত হইতে দেখা যায়। কেবল ছিপির মুখের কাছে উহা ঘনীভূত হইয়া ধোঁয়ার আকার ধারণ করে না, বাতাসের ন্যায় স্বচ্ছ ও অদৃশ্য থাকে; মুখ হইতে একটু দূরে গিয়া ঘনীভূত ধোঁয়ার আকার ধারণ করে।

তাপ—অনুক্রম ও রশ্মিময়।

তাপ দুই প্রকারে আপনাকে বিস্তৃত করে। কখনো বা ক্রমে নিকটস্থিত বস্তু দ্বারা, থাকের পর থাকের দ্বারা, স্তরের পর স্তরের দ্বারা, অণুর পর অণুপ্রবেশ দ্বারা, দ্রব্য মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে তাপ পৃথিবীর বক্ষ মধ্যে প্রবেশ করে। যদি কোন এক বস্তু উননের আগুণের ভিতর ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহাতেও তাপ ঐরূপ গতিতে প্রবেশ করে। এইরূপ গতিবিশিষ্ট তাপকে সাধারণ

তাপ বা অণুগত তাপ বা অনুক্রম তাপ কহে। আবার কখনো বা অতি বেগে আলোকের ন্যায় তাপ দূর হইতে দূরে আপনাকে সন্তত করে। এবং আলোক যেমন স্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাপও তাপাচ্ছ (Diathermanous) কতকগুলি পদার্থ ভেদ করিয়া বাহির হয়। এই তাপকে রশ্মিময় তাপ বা তাপকিরণ (Radiated heat) কহে।

সূর্য্য হইতে যে তাপ আমাদের নিকট: আসে, তাহা রশ্মিময় তাপ ; কারণ তাহা আলোকের ন্যায় প্রায় নয় কোটী মাইল আকাশ অতিক্রম করিয়া, এবং আলোকের ন্যায় পৃথিবীর উপরিস্থ প্রায় পঁচাত্তর মাইল স্থূল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া তবে আমাদের নিকটস্থ হয়। কিন্তু ঐ তাপকিরণ যখন পার্থিব বস্তু দ্বারা শোষিত হয়, তখন তাহাই অনুক্রম তাপ হইয়া নিকটে নিকটে বিস্তৃত হইতে হইতে ক্রমে তাহাদিগের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে উষ্ণ করে।

আমাদিগের উনন হইতে যে তাপ বিনির্গত হয়,

তাহাও সূর্য্যতাপের ন্যায় তাপকিরণ; কারণ দূর হইতে এবং বাতাসের অন্তরালে থাকিয়াও আমরা সেই তাপ অনুভব করি, এবং যদি উননের মুখে একটা কলাইবিহীন কাচ রাখিয়া দিই, তাহারও ভিতর দিয়া আমরা অগ্নির তাপ অনুভব করিতে থাকি।

কিন্তু সূর্য্যতাপের ন্যায় পৃথিবীস্থ উননেরও তাপ-কিরণ যখন পার্থিব পদার্থ দ্বারা শোষিত হয়, তাহাও অনুক্রম তাপ হইয়া পড়ে। আবার অনুক্রম তাপও অবস্থাবিশেষে রশ্মিময় হয়। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, এক প্রকার তাপ সহজে অন্য প্রকার তাপে রূপান্তরিত হয়। যদি কোন গোলক অগ্নিকুণ্ডে গরম করা যায়, তবে তাহার সকল দিক হইতে

৭ম চিত্র।

এইরূপ তাপকিরণ বিনিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। যতক্ষণ উহা অগ্নি বা আলোকের দ্বারা প্রদীপ্ত থাকে, তত-ক্ষণই যে কেবল ঐরূপ হয়, তাহা নহে; যখন উহা জ্বলন্ত থাকে না, এবং অন্ধকারের মধ্যে যখন অদৃশ্য
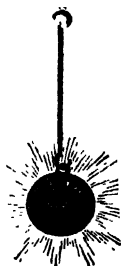
হয়, তখনও তাপকিরণ বহির্গত হয়। ইহা যথার্থ বটে যে, প্রদীপ্ত সময়ে বায়ু ভেদ করিয়া বা কাচ ভেদ করিয়া যে পরিমাণ তাপ অনুভব করা যায়, নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত সময়ে ততটা না হইলেও তাহা স্পষ্ট অনুভব করা যায়।

তাপের প্রতিফলন। আবার, এই তাপকিরণ, প্রদীপ্ত হউক বা তমসাবৃতই হউক, আলোকের ন্যায় প্রতি-ফলিত হয়। দুই ন্যুব্জ দর্পণকে চারি পাঁচ গজ দূরে

৮ম চিত্র।
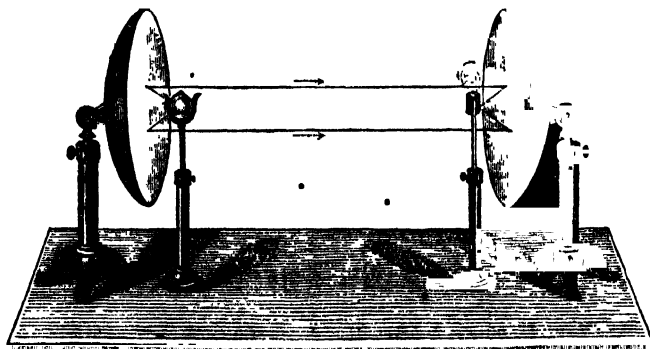
পরস্পরের প্রতি সম্মুখভাবে রাখিয়া, তাহার একটার অধিশ্রয়ে জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া, আর একটার অধি- শ্রয়ে দিয়াশলাই প্রভৃতি জ্বলনশীল দ্রব্য ধরিলে তাহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে; যদি অঙ্গারের বদলে এক দিকে অপ্রজ্বলিত অথচ গরম গোলা রাখা যায়, তবে সেই গোলা হইতে আস্তে আস্তে হাত সরাইতে সরাইতে অন্য আয়নার অধিশ্রয়ে হাত ধরিলেই তীব্র তাপ অনুভূত হইবে। তাহা গোলার তাপকিরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং তাহা নিকটস্থ আয়নায় বায়ু ভেদ করিয়া পড়িয়াছিল; সেই তাপকিরণ সকল প্রতিফলিত হইয়া অপর আয়নায় গিয়া পুনর্ব্বার প্রতিফলিত হইয়া, সেই আয়নার ন্যুব্জতা হেতু অধি- শ্রয়ে আসিয়া একত্রীভূত হইল।

যখন পদার্থ সকল উষ্ণ বা দহনোষ্ণ থাকে তখনি যে তাহারা তাপকিরণ প্রস্তুত করিতে থাকে, তাহা নহে; তাপকিরণ নিরন্তরই প্রস্তুত হইতে থাকে। যখন তাহাদিগকে উষ্ণ বোধ হয় না, যখন তাহারা ঠাণ্ডা হয়, যখন বরফের মত ঠাণ্ডা হয়, অথবা আমাদের যত দূর

সাধ্য, কৃত্রিম উপায়ে তাহাদিগকে যখন তত দূর ঠাণ্ডা করি, তখনও তাহাদিগের হইতে তাপকিরণ প্রসৃত হইতে থাকে। মেরুস্থিত তুষাররাশি, সেই সকল উচ্চতম পর্ব্বতশৃঙ্গ যাহারা নিরন্তর তুষারাবৃত হইয়া পলিতকেশে স্থিতি করিতেছে, ইহাঁরাও তাপভাগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। পৃথিবীস্থ এই সকল শীতলতম পদার্থেরাও নিরন্তর কিছু না কিছু তাপকিরণ বিনিঃসৃত করে, এবং সেই তাপকিরণ ভূলোকস্থিত বায়ু ও অন্তরীক্ষস্থ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া অসীমরূপে প্রসারিত হইতে হইতে দ্যুলোকরাজ্যে আপনাকে অন্তর্হিত করে।

এইরূপে আমাদের ভূমণ্ডল, যেমন আলোক দ্বারা, তেমনই তাপসহায়ে, যেমন দৃষ্টচর দ্বারা, তেমনই অদৃশ্য মধ্যস্থের সহায়ে, আমাদের সৌরজগতের অপরাপর গ্রহমণ্ডলের সহিত, এবং যত দূর চক্ষু বা দূরবীণ যায়, তত দূরস্থিত নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত, এবং তদ্ব্যতীত সেই সমুদয় জগন্মণ্ডল; যাহা অনন্ত আকাশের অসীম গভীরে ছড়াইয়া আছে, সেই সকলের প্রত্যেকের সঙ্গে

এবং তাবতের সঙ্গে, গূঢ় সম্বন্ধ ও জ্ঞাতিকুটুম্বত্ব স্থাপন করিয়া, সর্ব্বদা সম্বাদ আদানপ্রদান করে। আমরাও সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র পার্থিব ভাব হইতে, স্বার্থপর ভাব হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া, ব্রহ্মকে মধ্যস্থ করিয়া, দেবতা-দিগের সহিত সমান হইয়া বলিতে থাকি—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহ-মেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥" হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রেরা! তোমরা যেমন দ্যু-লোকে থাকিয়া ব্রহ্মকে জানিতেছ, আমরাও ভূমণ্ডল-বাসী হইয়া এই অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি; তিনি যেমন তোমাদের পিতা-মাতা, সেইরূপ আমাদেরও পিতামাতা; অতএব, তোমরা আমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদিগকে আমরা সম্বোধন করিতেছি।

চৌম্বক।

চুম্বক ও লৌহের মধ্যে যে আকর্ষণ পরস্পরের প্রতি কার্য্য করে, তাহাকে চৌম্বক বলে। খনিজ চুম্বক অথবা চুম্বক-প্রস্তর এক প্রকার লৌহভস্ম (oxide of

iron), এবং তাহা সচরাচর লৌহখনিতেই, কখন বা এখানে ওখানে দুই এক ছোট খণ্ডে পাওয়া যায়, কখন বা বৃহৎ খণ্ডরূপে পাওয়া যায়, এবং কখন বা তাহা স্থূল স্তরের পর স্তরে চুম্বকের পর্ব্বতরূপে অবস্থিতি করে ; এইরূপ পর্ব্বতের প্রতি অংশই চুম্বকধর্ম্মোপেত ও লৌহকে আকর্ষণ করে।

চৌম্বক কি? এখন, আকর্ষণ কেবল একের হইতে পারে না ; আকর্ষণ সর্ব্বথা পারস্পরিক, এবং লৌহ নিজে চুম্বকের দ্বারা যতটুকু আকৃষ্ট হয়, চুম্বককেও ততটুকু আকর্ষণ করে। আকর্ষণরূপ কার্য্যটি উভয়-সম্বন্ধীয় কার্য্য ; ইহা আকর্ষক ও আকৃষ্ট, উভয় পদার্থে একই সময়ে বিরাজ করে। এই আকর্ষণশক্তি লৌহ ও চুম্বক উভয় হইতে ভিন্ন ; ইহার হ্রাসবৃদ্ধি করা যাইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য পদার্থের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না।

সম্মুখে যে যন্ত্রের চিত্র দেখিতেছ, ইহা লৌহের পত্র-মারা স্বাভাবিক চুম্বক ; ইহার দুই পায়াকে দুই কেন্দ্র বলে। উহাদের নীচে যাহা লাগিয়া রহিয়াছে,

উহাও লৌহেরই নির্ম্মিত—উহা দূর হইতে কেন্দ্র-দ্বয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছে। দূরত্ব যত সংক্ষিপ্ত হয়, আকর্ষণবল তত শীঘ্র সংবর্দ্ধিত হইতে থাকে; এবং যখন কোন ঝুলান লৌহ-পদার্থ একবার চুম্বক-কেন্দ্র স্পর্শ করে, তখন তাহাকে অধিক বা অল্প বলে টানিলেও তাহা শীঘ্র খুলিয়া আসে না। যদি চুম্বক মৃদুশক্তি হয়, তাহা হয় ত ছটাক দুইমাত্র লৌহ ঝুলাইতে পারে; আর যদি চুম্বক বলবান
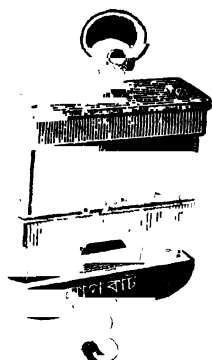
৯ম চিত্র।

হয়, তাহা হইলে তাহাতে দুই মণ লৌহও ঝুলান যাইতে পারে। আবার কৃত্রিম চুম্বককে এত দূর শক্তিবিশিষ্ট করিয়া প্রস্তুত করা যায় যে, তাহা ২০।২৫ মণ ওজনের দ্রব্য অনায়াসে বহন করিতে পারে।

দিগ্বীক্ষণ। দিগ্বীক্ষণের (magnetic compass) কাঁটা কৃত্রিম চুম্বক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা একটি সুনম্য কৃষ্ণায়স শলাকা, এবং ইহাতে চৌম্বক-

শক্তি উৎপন্ন করা গিয়াছে। সকলেই অবগত আছেন যে, পৃথিবীর সকল স্থানেই, কি সমুদ্রের উপর, কি দেশবিদেশে, দিগ্বীক্ষণের কাঁটা একটি নির্দ্দিষ্ট দিকের প্রতি—উত্তর দিকের প্রতি লক্ষ্য করে, কিন্তু ঠিক উত্তর দিকে নহে; উত্তর দিকের এক আধটুকু এদিক ওদিক হেলিয়া থাকে—কোন কোন প্রদেশে ঐ কাঁটা উত্তরের একটু পূর্ব্বদিকে হেলে, অন্যত্র বা উত্তরের একটু পশ্চিম দিকে হেলে। ইউরোপ খণ্ডে স্থান ও সময়বিশেষে অধিক বা অল্প পশ্চিমেই হেলিয়া থাকে। পারিস নগরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দিগ্বীক্ষণ কাঁটা ১৯° ৪১´ পর্য্যন্ত পশ্চিমে হেলিয়াছিল।

ভূগোল-চৌম্বক। যখন একটিতে নহে, দুটিতে নহে, পৃথিবীস্থ সকল দিগ্বীক্ষণেতেই এইরূপ সংঘটিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, এমন কোন সাধারণ চৌম্বক-শক্তি আছে, যাহা একই সময়ে উহাদিগের সকলকেই আহ্বান করিতেছে; যাহা উহাদিগকে ঘুরাইতেছে, ফিরাইতেছে, এবং চালাইতেছে; যাহা উহাদিগকে একরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছে,

নিমেষের জন্যও মুক্ত হইতে দেয় না। এই যে সাধারণ চৌম্বকশক্তি, ইহা ভূগোলচৌম্বক, এবং ভূ-মণ্ডল স্বয়ংই এক চুম্বক।

অনেকের মতে পৃথিবী সূর্য্য হইতে, বা সৌরজগ-তের অন্য কোন স্থান হইতে, বা কোন নক্ষত্র হইতে, অথবা আকাশের অন্য কোনও স্থান হইতে কোন চৌম্বকশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু নানা ঘটনা দ্বারা এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সূর্য্য এবং ভূগোলচৌম্বকের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। দেখা গিয়াছে যে, সূর্য্যের বিম্বমধ্যে যখন কলঙ্কের ভাগ অধিক হয়, তখন মধ্যে মধ্যে দিগ্বীক্ষণের কাঁটার লক্ষ্য অন্যথাভাব ধারণ করে।

তাড়িত।

ঘর্ষণে তাড়িতোৎপত্তি

কোন কোন দ্রব্য ঘর্ষিত হইলে, নিকটবর্ত্তী সকল প্রকার হাল্‌কা পদার্থকে যে আকর্ষণ করে, তাড়িত তাহার কারণ। যদি ধুনা বা গালার খুব মোটা শলাকে লোমশ বা রেশমী

কাপড়ের দ্বারা খুব ঘর্ষণ করিয়া তাহার সম্মুখে গাছের মাইজের ছোট ছোট গুলি মসিনা বা শণের সূতা দিয়া অথবা চেক্‌নাই রেশমী সূতা দিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ধুনা বা গালার শলা তাহা-দিগকে অনেক দূর হইতেও আকর্ষণ করে। ইহা কাঠের গুঁড়া, পালকের লোম, সোনার পাত প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্যকেও আকর্ষণ করে। কাচ, গন্ধক, তৃণমণি (Amber), বিশেষতঃ লাক্ষা এই গুণ অধিক পরিমাণে ধারণ করে। কিন্তু কাচ প্রভৃতি দ্রব্যের শলাতে ঐ গুণ কতকক্ষণ পরে আর থাকে না; তখন আবার লোমশূন্য বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়। নিম্নে অঙ্কিত তাড়িত যন্ত্র এই নিয়মমূলের উপর নির্ভর করে।

তাড়িত যন্ত্র। ইহাতে একটি বৃহৎ কক কাচের চাক্‌তি আছে; তাহার উপরে ও নীচে, দুই দিকে খ ও গ দুইটা গদির মত আছে—তাহার মাঝে কাচটা রহিয়াছে। কাচের মধ্যখানে একটা বাঁট ঘ সংযুক্ত রহিয়াছে। আবার এই কাচের সঙ্গে চ ও ছ দুইটি
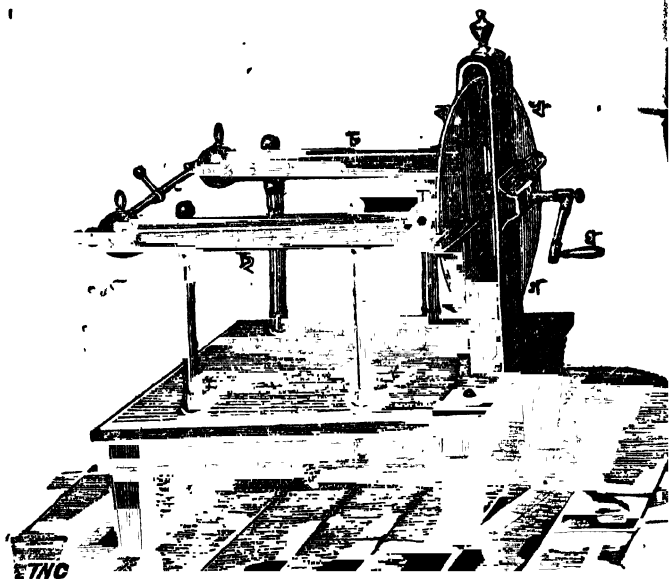
পরস্পরসংযুক্ত পরিচালক লাগান রহিয়াছে। এখন, ঘ বাঁট যত ঘুরান যায়, কাচটাও তত ঘুরে; কাচ ঘুরিলেই গদি দুইটার সহিত খুব ঘর্ষণ লাগে। তাহাতে যে তাড়িত উৎপন্ন হয়, তাহা কাচের চাকৃতি হইতে সম্মুখস্থ বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পরিচালকে উপস্থিত

হয়, এবং নিমেষ মধ্যে পরিচালকের পৃষ্ঠোপরি প্রসৃত হয়। এইরূপে কাচ হইতে উৎপন্ন তাড়িত, পরিচালকে উপস্থিত হইয়া অধিকাধিক জমা হইতে থাকে। পরিচালক এইরূপ তড়িদুপেত হইয়া যে কেবল হাল্‌কা সামগ্রী আকর্ষণ করে তাহা নহে; কিন্তু যদি তাহার কতক অঙ্গুলি পরিমিত স্থান নিকটে হস্ত লইয়া যাওয়া যায়, তবে তাহা হইতে অকস্মাৎ জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে দেখা যায় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুট্‌পুট্‌ শব্দও শ্রুত হয় এবং হস্তে, বাহুতে এবং কখন কখন সমুদয় শরীরে, অল্পই হউক বা অধিকই হউক, এক প্রকার উদ্বেজনা উপস্থিত হয়। এইরূপে তাড়িত, স্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ বায়ু মধ্যে আলোক ও শব্দ উৎপাদন দ্বারা আপনার গৃহীত পথকে ব্যক্ত করে।

পরিচালক ও ধারক। সকল পদার্থেরই সমান পরিচালকতা গুণ নাই অর্থাৎ সকল পদার্থ সমান ভাবে তাড়িতকে প্রসৃত হইতে বা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে দেয় না। ধাতুকে পরিচালক বলে, কারণ ইহা যত বড়ই হউক না, তাড়িতকে ক্ষণমাত্রে আপনার

সমুদয় পৃষ্ঠের উপর উপনীত বা পরিচালিত করে। জল, ভিজা বাতাস, ভিজা মাটি, মনুষ্যদেহ, সুতা বা তুলার দ্রব্য, ইহারাও পরিচালক; কিন্তু ইহাদের পরিচালকতা ধাতু অপেক্ষা কম। ইহার বিপরীতে কাচ, লাক্ষা, ধুনা, গন্ধক, শুষ্ক বায়ু, রেশমী বা লোমশ দ্রব্য, ইহারা অপরিচালক বা ধারক; ইহারা তাড়িতকে পরিচালন করে না, কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখে, আবদ্ধ রাখে।

তাড়িত কি? সম্ভবত তাপেরই ন্যায় তাড়িতও গতিবিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। পদার্থের অণু সমূহে এক বিশেষরূপ গতি উৎপন্ন হইলেই তাহাকে তাড়িত বলা যায়। তাড়িত যাহাতে অবস্থিতি করে তাহা ভারগ্রস্ত হয় না এবং ইহাকে আমরা এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালন করিতে পারি।

ওয়ালের আবিষ্কার। গালার দণ্ড যখন অত্যন্ত শুষ্ক ও অত্যন্ত তড়িতুপেত হয়, তাহা হইতেও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। এইরূপ অদৃশ্যপ্রায় স্ফুলিঙ্গ প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ওয়াল নামক যে বিজ্ঞানবিৎ ইহা প্রথম

দৃষ্টি করিয়াছিলেন তিনি ইহার শব্দকে বজ্রধ্বনির ক্ষুদ্র অনুকৃতি এবং ইহার আলোকবিন্দুকে বিদ্যুৎপদ্ধতির অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই যে নৈসর্গিক ব্যাপারের সহিত ঐ অতি ক্ষুদ্র ঘটনার আশ্চর্য্য তুলনা, ইহা দ্বারা প্রকৃত সত্যই ব্যক্ত হইয়াছিল; এই সত্য প্রথম ঊষাকিরণের ন্যায় প্রকাশ পাইয়া অবশেষে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইল। ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবার জন্য আরও এক শতাব্দীর অনুসন্ধান, পরিশ্রম ও পরীক্ষা লাগিয়াছিল।

ফ্রাঙ্কলিনের আবিষ্কার। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালে বিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিন প্রতিভা দ্বারা চালিত হইয়া ঝড়ের মেঘ হইতে বজ্রশিখা স্বকীয় পদতলে আনয়ন করিবার জন্য প্রগল্‌ভ হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন এবং পদতলে আনীত স্বয়ং বজ্রের নিকট হইতেই তাহার উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই অবধি নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িল, গাঢ় অন্ধকার ঘুচিয়া গেল এবং সত্যের জ্যোতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই সময়ে প্রধানতঃ ফ্রান্সদেশে তাড়িত-ঘুড়ির দ্বারা যে সকল মহান্ ও

উজ্জ্বল পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা দ্বারা কেবল তাড়িত-স্ফুলিঙ্গ নহে, কিন্তু বহুহস্ত দীর্ঘ বিদ্যুৎশিখাপত্র সকল ভূমিতলে অবতরণ করান গিয়াছিল এবং উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা তাহাকে আমাদের তড়িৎযন্ত্রনির্গত তাড়িতের সদৃশ বলিয়া চিনিতে পারা গিয়াছিল।

তাড়িত-চৌম্বক।

চৌম্বক ও তাড়িতের পরস্পরের মধ্যে, যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাহা অধুনাতন তাড়িতচৌম্বকের অন্তর্ভূত। বিজ্ঞানের এই শাখাটী যেমন নূতন আবিষ্কৃত, তেমনি ইহা বিস্তৃত ও উর্ব্বর। অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু অধিককাল গত হইল, ইহার মধ্যেই ইহা হইতে রাসায়নিক তাড়িত ও তাড়িতবার্ত্তাবহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা এই শাখার জন্ম ও বিস্তৃতি লাভ হইয়াছে—(১) ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গাল্বানির আবিষ্ক্রিয়া; (২) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে বল্টার আবিষ্ক্রিয়া; এবং (৩) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে অয়রষ্টেডের আবিষ্ক্রিয়া।

এখন এই তিন প্রধান আবিষ্ক্রিয়ার প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সংক্ষেপে ইহাদের লক্ষণ বিবরণে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। ইহাদের দ্বারা বিজ্ঞানের নূতন পথ সকল উন্মুক্ত হওয়াতে ইহাদের হইতে আবার এক এক শ্রেণীর নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া সকল বাহির হইতেছে।

গাল্বানি। গাল্বানি সূক্ষ্মরূপে নিষ্পাদিত অনুসন্ধানপরম্পরা দ্বারা এই একটী প্রধান তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইলেন যে, যদি মৃত বেঙের শরীরকে উপযুক্তমতে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহার মাংসপেশী ও স্নায়ুকে পরস্পরসংলগ্ন তাম্র ও দস্তাফলক দ্বারা একদা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে, ভেক জীবিত কালে ঐ মাংসপেশী ও স্নায়ুর সহিত সংযুক্ত অঙ্গ সমূহে স্ববলে যেরূপ গতিক্রিয়া উত্তেজিত করিতে পারিত, এইরূপ স্পর্শের দ্বারাও ঠিক সেইরূপ গতি বিধান করা যাইতে পারে।

এরূপ ঘটনার কারণ কি হইতে পারে? এই তো নিজ চেষ্টাবিহীন, প্রাণক্রিয়াশূন্য, ছিন্নকলেবর জড়-

রাশি (inert mass)—ইহা অকস্মাৎ জীবনের আকার ইঙ্গিত কিরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হইল ? প্রথমে সকলে মনে করিয়াছিল, দেহসঞ্চালন দ্বারা বুঝি শারীররচনা-প্রণালীরই কোন ভেদ ব্যক্ত হইতেছে ; তাহাদের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বুঝি শরীরের মধ্যে এমন কোন জৈবনিক তরল পদার্থ আছে যাহা, স্নায়ু ও মাংস-পেশীকে একদা স্পর্শ করিলে, দেহমধ্যে সঞ্চালিত হইয়া ঐরূপ অঙ্গচালনা উৎপন্ন করে। লোকে যতই দেখিতে লাগিল যে, ঐ ব্যাপার কেবল যে ভেকেরই মৃত শরীরে দেখা যায় তাহা নহে, কিন্তু সকলেরই মৃত-দেহে ঐরূপ হয় ; কেবল যে মৃতদেহে তাহাও নহে, আবার জীবন্ত পশুতেও ঐরূপ ঘটনা ঘটে এবং উহা নানারূপে প্রকাশ পায় ; এবং যখন পরীক্ষকেরা স্বয়ং উৎসাহপূর্ণ হইয়া স্বীয় শরীরের নানাস্থানে উপরের চর্ম্ম উঠাইয়া তাম্রফলকের এক প্রান্তে দস্তাফলক সংলগ্ন করিয়া ঐ উভয় ধাতুর অন্য দুই প্রান্ত দ্বারা একদা নিম্নস্থ চর্ম্মের দুই ভিন্ন অংশ স্পর্শ পূর্ব্বক ঐরূপ অপূর্ব্ব ইন্দ্রিয়বোধ অনুভব করিতে লাগিলেন,

তখন সকলে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াই আদরপূর্ব্বক ইহাকে স্বীকার করিয়া লইল। এইরূপ অনুমানসিদ্ধ পদার্থের নাম সকলে গাল্বানীয় তরল পদার্থ রাখিলেন। যে সকল ঘটনা গাল্বানি কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত ঘটনার অনুরূপ, তাহাদিগকে লোকে গাল্বানিক্রিয়া বলে।

বল্টা। বল্টা এই প্রমাণ করিলেন যে ঐরূপ গাল্বানিক সংকোচ-গতি এবং অপরাপর ঘটনা, যাহা গাল্বানিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, তাহা তাড়িত ব্যতীত আর কিছুই নহে; কিন্তু বল্টার আবিষ্কৃত তাড়িত অন্য তাড়িতের মত ঘর্ষণ দ্বারা আবিষ্কৃত না হইয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব কোন বিশেষ অবস্থায় আবির্ভূত হয়। পরে তিনি অনেক নূতন পরীক্ষা দ্বারা আপনার মত সমর্থন করিয়া সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তপরম্পরা দ্বারা স্তম্ভযন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন —এই আশ্চর্য্য যন্ত্র বিজ্ঞানের পক্ষে এক নূতন অব্দের সূচনা করিয়া দিয়াছে, বলিতে হইবে।

বল্টার স্তম্ভ। বল্টার স্তম্ভকে তাড়িতের স্বাভাবিক ও অক্ষয় আকররূপে গণ্য করা যাইতে পারে। মশাল

যেমন অবিচ্ছেদে আলোক প্রদান করে এবং উনন যেমন তাপ প্রদান করে, তদ্রূপ এই স্তম্ভ তাড়িতস্রোতকে অবিচ্ছেদে প্রবাহিত করে। ইহার পরবর্ত্তী আবিষ্ক্রিয়া সকল বণ্টার প্রথম আরম্ভকে এরূপ সুসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে তাড়িতস্রোত এখন কবচের মধ্যে আসিয়াছে—একটী সুনিশ্চিত নিয়মের মধ্যে আসিয়াছে; ইহার স্রোতের গতিকে যে দিকে ইচ্ছা চালান যাইতে পারে; ইহার আতিশয্য বা প্রগাঢ়তা নিয়মিত করা যাইতে পারে। এই স্রোতকে এত মৃদু করা যায় যে তাহা বেঙের অঙ্গ সংকুচিত করিতে পারে কি না সন্দেহ; আবার ইহাকে এত পরাক্রমশালী করিয়া তুলা যায় যে আকাশের বজ্রের সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে, কারণ তখন বজ্রের ন্যায় ইহা জীবন ধ্বংস করে, বড় বড় ধাতুখণ্ডকে গলাইয়া বাষ্প করিয়া ফেলে; তবে কি না, ইহা এমন এক প্রকার বজ্র, যাহা ইচ্ছা করিলে উৎপন্ন করা যায় এবং ইচ্ছানুসারে যাহা চালিত ও নিয়মিত হয়।

প্রথম প্রথম যে সকল তড়িদুদ্গম যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের উপরোক্ত কোনই অসাধারণ

ক্ষমতা ছিল না বটে কিন্তু তাহারা ঐ ক্ষমতাকে সূত্র-রূপে ধারণ করিত ; সেই ক্ষমতাকে সম্যক প্রকাশ করিতে তখনও অনেক পরীক্ষাপরম্পরার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোন বিষয়ের প্রথম আরম্ভ জানিতে আমাদের যেমন আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না ; এই জন্য বল্টা তাঁহার যন্ত্রের যেরূপ গঠন করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল। এইরূপ স্তম্ভাকারে স্থাপিত হওয়াতে ইহার নামই স্তম্ভযন্ত্র হইয়া গেল।

এই স্তম্ভ, যাহাকে স্তম্ভের পোস্তাও বলে, নিম্নলিখিত উপকরণে রচিত হয়। সকলের নীচে দস্তার চাক্‌তি, তাহার উপর একটা ভিজা পদার্থের চাক্‌তি, তাহার উপর একটা তাম্র চাক্‌তি—ইহাই স্তম্ভের প্রথম মূল থাক হইল। তাহার পরে অবিচ্ছেদে ঐরূপ শ্রেণীপরম্পরায় আরও অনেকগুলি থাক বসাইতে হইবে। প্রথম থাকের পরে যথাক্রমে দস্তার চাক্‌তি, ভিজা চাক্‌তি ও তাম্র চাক্‌তি বসাইলে তাহা স্তম্ভের দ্বিতীয় মূল থাক হইবে। এইরূপ শত-থাক পোস্তা

১১শ চিত্র।

নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। কানির, কাঠের, লোমজমাট, বস্ত্রের বা মণ্ডপাটের (কাগজজমাট) চাক্‌তিকে ঈষৎ অম্ল লবণ বা ক্ষারবান্ জলের দ্বারা সিক্ত করিলে তাহাকে ভিজা চাক্‌তি বলে।
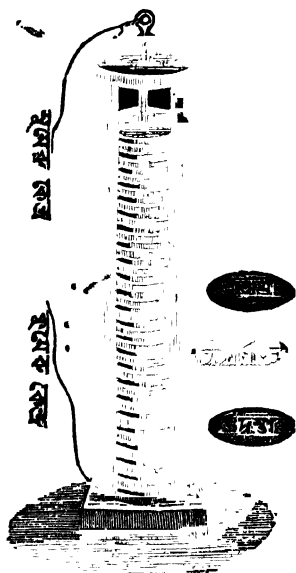
এইরূপে যখন পোস্তা গাঁথা শেষ হইল, তখন যদি কেহ একদা একহাতে তাহার মূল ও অপর হাতে তাহার অগ্রভাগ স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে তীব্র উদ্বেজনা অনুভব করিবে; যদি হাত ভিজা থাকে, বিশেষতঃ যদি দুই হাতের সহিত দুইটী ধাতুনির্ম্মিত ভিজা চোঙার যোগ থাকে, তাহা হইলে

উদ্বেজনা আরও অধিকতর অনুভূত হয়। যে দুই স্থান স্পর্শ করা যায়, তাহাদিগকে দুই কেন্দ্র বলা যায়। ঐ দুই কেন্দ্র বা স্পৃষ্ট স্থানের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক থাক ব্যবধান থাকে, ততই তাড়িতের কার্য্য বেশী হয়।

দুই জন হৌক, দশ জন হৌক, শত জন হৌক, যদি পরস্পর হাতাহাতি করিয়া গোল হইয়া দাঁড়াইয়া, প্রথম ব্যক্তি যখন স্তম্ভের মূলে হাত দিয়া রহিয়াছে, শেষ ব্যক্তি যদি তখন স্তম্ভের অগ্রভাগে হস্তার্পণ করে, তাহা হইলে ঐ ঘেরের তাবৎ মনুষ্যই সেই একই সময়ে উদ্বেজনা অনুভব করিবে এবং যতক্ষণ স্তম্ভের সহিত সংস্পর্শ থাকে ও ঘেরটা অবিছিন্ন থাকে অর্থাৎ যদি সকলেই পরে পরে আপনার ভিজা হাত দিয়া অন্যের ভিজা হাত ধরিয়া বা স্পর্শ করিয়া থাকে, উদ্বেজনাও ততক্ষণ অবিচ্ছেদে অনুভূত হইতে থাকে। মধ্যে যদি কিছু মাত্র বিচ্ছেদ থাকে, তাহা হইলে ঘের খুলিয়া গেল, তাড়িত আর চলাচল হইবে না এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সকল ক্রিয়াফল (effect) বন্ধ হইয়া যাইবে।

ঘেরটা স্তম্ভ হইতে অনেক দূরে থাকিতে পারে। পারিস নগরে স্তম্ভটা এবং ঘেরটা লণ্ডন নগরে থাকিতে পারে। কেবল ঐ ঘেরকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য বার্ত্তাবহের তারের মত লণ্ডন হইতে পারিস পর্য্যন্ত বিস্তৃত দুইটী সংবৃত (isolated) তার আবশ্যক। পারিস নগরে স্তম্ভের মূলের সঙ্গে একটা তার এবং তাহার অগ্রভাগের সঙ্গে আর একটা তার সংযুক্ত থাকা চাই। এখন, লণ্ডনেই হউক, পারিসেই হউক, যেখানেই হউক, যেই ঘেরটা জোড়া দেওয়া যাইবে, অমনি ঘেরের সর্ব্বত্র তাড়িত-স্রোতের আবির্ভাব অনুভূত হইবে। যদি ঘেরের মধ্যে কোন স্থান খোলা না থাকে, যদি সংলগ্নতার (continuity) মধ্যে কিছু বিচ্ছেদ না থাকে, তবে স্তম্ভের বল বৃদ্ধি করিলে সর্ব্বত্রই তাড়িতপ্রবাহও বৃদ্ধি পাইবে।

এই সকল পরীক্ষাতে, (যাহা আজ কাল মনে করিলেই অনায়াসে করা যাইতে পারে এবং বাস্তবিক আর এক আকারে যাহা এখন করা হইয়াই থাকে), তাড়িত, স্তম্ভের মধ্যে নিয়ত উৎপন্ন ও প্রকাশিত

হইয়া অবিরতভাবে একক্ষণের মধ্যেই ঘেরের সমুদয় তারে ও পরিচালক পদার্থে ব্যাপ্ত হয়। ইহাকে সর্বদা-চর তাড়িত-স্রোত বলে।

স্তম্ভের বর্ত্তমান গঠন-প্রণালী।

এখন স্তম্ভের আকারের অনেক ভিন্নতা হইয়াছে। এখন যে সকল আকার চলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এক প্রকার এই :— ইহাতে কয়েক থাক দস্তা এবং কয়লা আছে। এই উভয় উপকরণের প্রত্যেক থাক একটি একটি কাচ-পাত্রের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে; এবং প্রত্যেক কাচ-পাত্রের মধ্যেই দস্তাটি দশম ভাগ গন্ধকদ্রাবকবিশিষ্ট জলে এবং কয়লাটী যবক্ষারদ্রাবকে ডুবান আছে। এই উভয় প্রকার তরল পদার্থ একটি ব্যবধান দ্বারা ব্যবহিত আছে; সে ব্যবধানটি আর কিছু নহে, কেবল সচ্ছিদ্র আধপোড়া মাটীর পাত্র। এই পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্র দ্বারা উভয় তরল পদার্থের পরস্পরের মধ্যে যোগও থাকে অথচ তাহারা মিশিতে পারে না। এক থাকের দস্তা তাহার পরের থাকের কয়লার সহিত একখণ্ড তামার পাতের দ্বারা সংযুক্ত

থাকে; এইরূপে প্রথম থাকের কয়লা এবং শেষ থাকের দস্তা দ্বারা স্তম্ভের দুই কেন্দ্র প্রস্তুত হয়। বাহিরের ঘের এই কেন্দ্রদ্বয়ে সংলগ্ন হইয়া শেষ হওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত স্তম্ভের ক্রিয়াস্থায়িত্ব।

তাড়িতক্রিয়ার স্থায়িত্বভাব এইরূপ স্তম্ভের একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা সুন্দররূপে বুঝাইতে হইলে ঐরূপ কয়েক-থাক স্তম্ভের স্রোতকে যদি প্লাটিন তারের ভিতর দিয়া চালান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম ঐ তারটি একটু গরম হয়, ক্রমে তাহা ঈষৎলোহিত, ঈষৎলোহিত হইতে গাঢ়লোহিত, তাহা হইতে আবার আরও উত্তপ্ত হইয়া শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থাতেই অবস্থিতি করে। কিন্তু এই পরীক্ষাতে তারকে গলিত করিবার মত অধিক উত্তাপ না হওয়া আবশ্যক। উত্তাপ তত বেশী হইলে তারটাকে উপযুক্ত পরিমাণে লম্বা করিয়া দিলেই তাহা নিবারণ হইতে পারে।

নিম্নতর কৌতুকাবহ পরীক্ষাও উহার স্থায়িত্বভাবকে সপ্রমাণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটীতে একটী
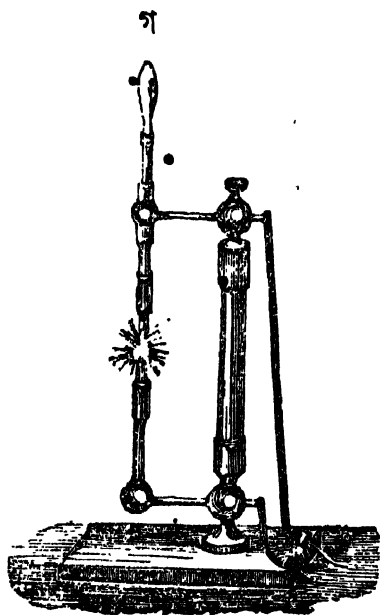
১২শ চিত্র।

অপরিচালক কাচের বাঁট রহিয়াছে; তাহার উপর নীচে ধাতু দিয়া মোড়ান। ঐ ধাতুদ্বয়ের মধ্য দিয়া নির্গত দুইটা ধাতুর শলাকাতে দুইটা কয়লাকাঠি বসান আছে এবং স্তম্ভের দুই কেন্দ্র ঐ দুই ধাতুময়ী শলাকার পশ্চাতে সংলগ্ন আছে। যেই কাচের হাতল 'গ' দ্বারা উপরকার কয়লাকাঠিকে নীচের কয়লার সঙ্গে স্পর্শ করান যায়, অমনি অকস্মাৎ উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া উঠে এবং যতক্ষণ স্তম্ভ হইতে স্রোত আসিতে থাকে, ততক্ষণ অবিচ্ছেদে এইরূপ জ্বলিতে থাকে; যখন কেহ ঘের খুলিয়া দেয় তখনই থামে, আবার ঘের বন্ধ করিলেই আলোক পূর্ব্বের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে।

এইরূপ ৫০ বা ১০০ থাক স্তম্ভ দ্বারা ক্ষণেকের মধ্যে অনেকটা রৌপ্য, স্বর্ণ বা প্লাটিন গলান যায়। লৌহ ও ইস্পাত যেমন অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দগ্ধ হয় সেইরূপ ইহা দ্বারাও দগ্ধ হয়। এই বিষয়ের পরীক্ষা করিতে গেলে নীচেকার কয়লাকে একটু প্রশস্ত করিয়া এবং তাহাতে একটু গর্ত্ত করিয়া লইয়া তাহার উপরে ধাতুটি রাখিতে হয়। যেমন—(১৩শ চিত্র দেখ)

১৩শ চিত্র।

অয়রষ্টেড

অয়রষ্টেড সপ্রমাণ করিয়াছেন যে স্তম্ভের স্রোত যদি তারের মধ্যে অথবা সাধারণতঃ কোন পরিচালক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে উহা চুম্বকের উপর অত্যন্ত গুণ-প্রকাশ করে; ঐ পরিচালক বস্তু চুম্বকের যতই নিকট বর্ত্তী হয়, তত অধিক বলে উহাকে নির্দ্দিষ্টরূপে চালনা করে। তাড়িতস্রোত যে তার দিয়া চলে, চুম্বকের কাঁটা তাহার প্রতি লম্বভাবে থাকিতে চেষ্টা করে।

এই আবিষ্ক্রিয়ার সময়, বিজ্ঞানের যে অংশের বিষয় আমরা এখন বলিতেছি, তাহা তাড়িতচৌম্বক নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেন না এই নাম দ্বারা তাড়িত ও চৌম্বক এতদুভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়াসম্বন্ধ নির্দ্দেশিত
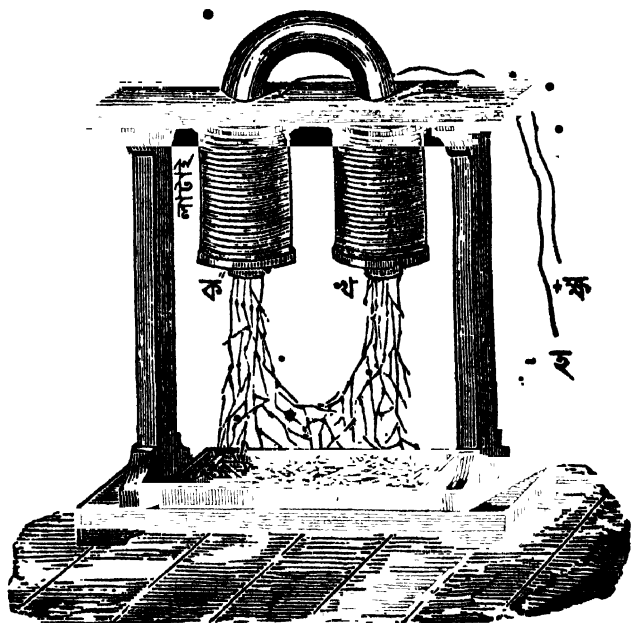
১৪শ চিত্র।

হয়। আমরা ঐ পারস্পরিক ক্রিয়াকে দুইটি পরীক্ষা দ্বারা সাধারণরূপে এক প্রকার বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

তাড়িত-চুম্বক যন্ত্র
(১৪শ চিত্র দেখ)

এই একটি তাড়িতচুম্বক ধাতু ঘ; ঘোড়ার পায়ে যেরূপ খুর বসায়, ইহা সেইরূপ বক্রাকার নীরেট লৌহ চোঙা; তাহার পরে 'গোটায়' যেমন সূতা জড়ান হয়, সেইরূপ ভাবে প্রায় ১/২৫ ইঞ্চি মোটা এবং বহু গজ লম্বা তামার তারকে সূক্ষ্ম রেশমের দ্বারা জড়াইয়া, সেই রেশম-জড়ানো তারের দ্বারা সূতার নলীতে যেমন সূতা জড়ায় সেই রূপ উক্ত নীরেট চোঙার উভয় বাঁট জড়াইতে হইবে। এইরূপ তার দিয়া জড়ানো চোঙাকে তাড়িতচুম্বক ধাতুর লাটাই বলে। এই দুই তারের শেষ সীমাদ্বয়ের (হ ও ক্ষ) কাছে রেশম জড়ান নাই, খোলা রহিয়াছে; ঐ দুই স্থান স্তম্ভের দুই কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। যেই স্রোত বহিতে থাকে, অমনি খুরাকার লৌহ ঘ বলবান চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়; অমনি উহা পিরেক প্রভৃতি লৌহখণ্ড আকর্ষণ করিতে থাকে; তাহারাও আবার অপরাপরকে এইরূপ আকর্ষণ করিয়া

ধরিয়া রাখে, তাহারাও আবার তাহাদের পালায় অপরকে ধরিয়া রাখে। এইরূপে একটি শিকলির মত প্রস্তুত হয়, সেই শিকলির প্রথম কড়া যেন তাড়িত-চুম্বক ধাতুর দুই কেন্দ্র ক ও খতে লাগিয়া আছে। যেই মাত্র কেহ ঘের খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া দেয়, অমনি স্রোত বন্ধ হয়; সেই ক্ষণেই যেন সকল আকর্ষণ শক্তি একবারে লোপ পায়, লৌহখণ্ড সকল পৃথক পৃথক হইয়া নিম্নে পড়িয়া যায়—তখন তাহারা ভারের আজ্ঞা ব্যতীত আর কাহারো কথা গ্রাহ্য করে না। এইরূপে তাড়িতচুম্বক ধাতু ঘেরের বন্ধ বা উন্মুক্ত অবস্থানুসারে আপনার শক্তি প্রাপ্ত হয় বা হারাইয়া ফেলে এবং এইরূপে একবার প্রবল আকর্ষণ, আর একবার সম্যক্ উদাসীনতা পুনঃ পুনঃ অতি সত্বর সাধন করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তী পরীক্ষাতে এ বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার তাড়িতচুম্বক যন্ত্র

এইটি আর একটি তাড়িতচুম্বক ধাতুর যন্ত্র কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী যন্ত্রের (১৪শ চিত্র দেখ) অপেক্ষা ছোট এবং বার্ত্তাবহন কার্য্যে যেরূপ
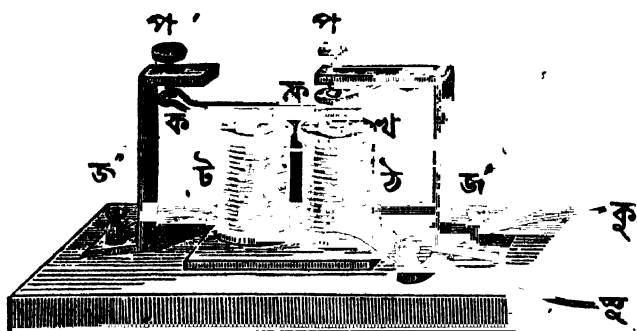
১৫শ চিত্র।

যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, ইহা তাহারই অনুরূপ। ক খ লাগবাঁট, যাহাকে এখানে তাড়িতচুম্বক ধাতুর পতর বলা যায়, ছট্‌কার মত সচল ও দোদুল্যমান ভাবে রহিয়াছে। প ও প´ পাকদণ্ড বা ঘূর্ণিকাদ্বয় উহার গতির সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পতরের স্থিতিস্থাপকতা উহাকে প ঘূর্ণিকাতে সংলগ্ন ফ ছটকাতে ঠেকাইয়া রাখে; এই ছট্‌কাকে প ঘূর্ণিকা ঘুরাইয়া ইচ্ছামত অধিক বা কম উঠান নামান যাইতে পারে। কিন্তু যখন ট ঠ তাড়িতচুম্বক ধাতু ক খ পতরকে আকর্ষণ করে, তখন উহা আপনার স্থান ছাড়িয়া আকর্ষণকারী কেন্দ্র-

দ্বয়ের প্রতি অবনত হয়। এখন, এই তাড়িতচুম্বক যন্ত্রকে এমন প্রস্তুত করা গিয়াছে, যাহাতে উহার ঘের আপনা হইতেই বন্ধ হয় এবং আপনা হইতেই খুলিয়া যায়।

এই তাড়িতচুম্বক যন্ত্রের তারের একটা শেষ সীমা স্থ তে আসিয়াছে, আর একটা সীমা জ´´ পায়াতে লাগান আছে। ঐ সমস্ত কাণ্ডটী ধাতু-নির্ম্মিত, সুতরাং তাড়িত-স্রোত আপনা হইতে পতরে পরিচালিত হয়; আবার পতর ফ ছটকাকে ছুঁইয়া থাকাতে পতর হইতে ঐ স্রোত ফ ছটকাতে যায় এবং ছটকা হইতে ঐ স্রোত ধাতুনির্ম্মিত জ´ কাণ্ডের নীচে কু তারে আইসে। এমতে স্থ এবং কু কে স্তম্ভের কেন্দ্রদ্বয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করিলেই ঘের জোড়া হইল এবং স্রোত চলিল। কিন্তু যেই ক্ষণ পতরটা ট ঠ তাড়িতচুম্বকের দ্বারা আকৃষ্ট হইল, অমনি পতরটা ফ ছটকা হইতে ছাড়িয়া আসিল এবং ঘেরটী ভাঙ্গিয়া গেল; অমনি তাড়িতচুম্বক ধাতুর আকর্ষণী শক্তি নষ্ট হইল, পতরও তৎক্ষণাৎ আপনার স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা ছটকাতে পুনরুত্থিত হইয়া ঘের

রুদ্ধ করিল; তাহাতে আবার তাড়িতচুম্বকে আকৃষ্ট হইল, আবার বিচ্ছেদ হইল; এইরূপ অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। অতএব ক খ পতর বিশ্রাম করিবার একটু অবকাশও পায় না, স্থানও পায় না। এইরূপ প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও বিনষ্ট আকর্ষণশক্তির আয়ত্তাধীন হইয়া পতরের আন্দোলন অত্যন্ত সত্বরতা প্রাপ্ত হয়। এবং উহা দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহার তীব্রতা কখন কখন প্রতিমুহূর্ত্তে বহুসহস্র কম্পনের সমান হয়।

ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা গেল, তাহা স্তম্ভযন্ত্রের, তাড়িত-স্রোতের এবং তাড়িতচৌম্বকের প্রথম ভাব উদ্দীপন করিবার পক্ষে, বোধ হয়, যথেষ্ট হইয়াছে। ইহা দ্বারা এখন ঈষৎ বুঝিতে পারিবে যে কেমন সহজে এই নূতন আবিষ্কৃত শক্তিকে নানা প্রকার কার্য্যে লাগান গিয়াছে। বিশেষতঃ যে যন্ত্র দ্বারা আমাদের চিন্তাস্রোত বার্ত্তা-বহের তারে শত শত যোজন দূরে এত দ্রুত সঞ্চালিত হয় যে কোন ঘরের ভিতর কয়েক পদ দূরে কথার শব্দ প্রচার হইতে যতটুকু বিলম্ব হয়, তাহাতেও তত

টুকুই বিলম্ব হয়, সেই আশ্চর্য্য যন্ত্র ইহা দ্বারা কিরূপ লাভ হইয়াছে তাহাও বুঝা যাইবে।

আণবিক ক্রিয়া।

অণুর সূক্ষ্মতা। দ্রব্যের অণু বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অণু যদি মনের অধ্যাহার্য্য বিষয় হইত, তাহা হইলে যেমন চতুষ্কোণ, গোল অথবা অন্য কোন ক্ষেত্র-তত্ত্বের আকার ব্যাখ্যা করা যায়, সেইরূপ উহাকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারিত। কিন্তু অণু বাস্তব পদার্থ; উহাকে ব্যাখা করিতে গেলে উহা যে কি, তাহা আগে জানা, এবং তাহাই বলা আবশ্যক। কিন্তু ঐ বাস্তব পদার্থটী এমনি সূক্ষ্ম যে, না আমরা তাহাকে ছুঁইতে পারি, না দেখিতে পারি, না কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করিতে পারি। এমন বাস্তব পদার্থ, যাহাকে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় না বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় না; যাহার আকার অজ্ঞাত, যাহার পরিমাণ অজ্ঞাত, যাহার অস্তিত্বের প্রকার অজ্ঞাত, তাহাকে কিরূপে

ব্যাখ্যা করা যাইবে ? অতএব ক্ষেত্রতত্ত্বের মত করিয়া অণুর ব্যাখ্যা আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইবে, কেননা উহা অধ্যাহার্য্য বিষয় নহে ; ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতে হয় সে প্রণালীও পরিত্যাগ করিতে হইবে, কারণ উহাকে আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারি না। তবে, যখন আমাদের কোন মনের ভাব ঠিকঠাক ব্যক্ত করিতে হইবে, তখন কি আমরা অণু কথা একেবারেই ব্যবহার করিতে পারিব না—অণু কথাটাকে কি আমাদের ভাষা হইতে একেবারেই বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে ? তাহা হইতে পারে না। পদার্থবিজ্ঞান এবং অধ্যাহার্য্য বিজ্ঞান সমান নহে—এই দুই বিষয় এক পথে চলে না ; আর আমাদের মনের এমনও শক্তি নাই যে, তাহা বাস্তব পদার্থকে স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ দেখিতে পারে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে। বিজ্ঞান দ্বারা কিছু সমস্তটা জানা যায় না, কতকটা জানা যায় মাত্র।

অণু এখন তবে আমরা অণুতে ও আণবিক ক্রিয়াতে ফিরিয়া যাই। যখন আমরা বালুকারেণু

বা হীরক বা অন্য কোন পদার্থকে একটা খলে পিষিতে থাকি, তাঁহাদের খণ্ডাংশ বা কণার সংখ্যা নিরন্তর অধিকই হইতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে যদি আমরা অবশেষে এমন অংশে আসি যাহারা সমান ভাবে থাকে, যাহারা অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, তাহা হইলে যে সকল পদার্থ হইতে আমরা এরূপ ফল পাইলাম, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, তাহাদের বিভাজ্যতার সীমা আছে; তাহাদের শেষ অণু দেখা দিয়াছে—সেই অণুদের এই আয়তন, এই আকার, তাহাদিগকে দেখিতে এইরূপ, তাহাদের গুণ এই; অণুর গুণ হয়ত আবার অণুরাশির অথবা দ্রব্যের গুণ হইতে ভিন্ন। কিন্তু কেহই এপ্রকার অণু দেখিতে পায় না। এমন কিছুই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ নাই যাহা বিভাজ্য নহে; অথবা আমরা এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা রাশি বা সমষ্টি নহে; যাহা পৃথক্ পৃথক্ অণুর অংশের একত্রীকরণ নহে। কিন্তু তথাপি আমরা বুঝিতে পারি যে, যত সূক্ষ্ম অংশ আমাদের চক্ষুর গোচর হইতে পারে, তাহাদেরও পরে এমন সুসূক্ষ্ম অংশ আছে

যাহাদিগকে ইন্দ্রিয় ধরিতে পারে না। তাহাদের ঘেঁসা-ঘেঁসি অবস্থিতি দ্বারা, তাহাদের শ্রেণীপূর্ব্বক সন্নিবেশ দ্বারা তাহাদেরই যোগে চক্ষুর গোচর অংশ সকল প্রস্তুত হয়। ঐ যে চক্ষুগোচর অংশের নির্ম্মাণকারী সূক্ষ্মতম অংশ-সকল, উহারাই বস্তুর অণু।

পরমাণু। ইহা যদি ঠিক হইল, তবে এখন অণুকে দুই রকমে দেখা যাইতে পারে। প্রথম, একটা অণুকে সম্পূর্ণ সবর্ণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; সে যে স্থানটুকু ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের সকল অংশেতেই সে আপনার সদৃশভাবে ব্যাপিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক অংশই সর্ব্বতোভাবে অপরাংশের সমান; এক অংশকে অপর অংশ হইতে পৃথক করিয়া চিনিয়া লইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ অণুকে পরমাণু বলে—হয়তো ইহা বিভাজ্য, হয়তো বিভাজ্য নহে; হয়তো ইহা বিকার্য্য, হয়তো বিকার্য্য নহে।

সংগত পদার্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমরা অণুকে সদৃশ বা বিসদৃশ অংশের এক প্রকার অথবা ভিন্ন প্রকার

পরমাণুর সমষ্টি মনে করিতে পারি। এরূপ হইলে কিন্তু সমস্ত অণুটা আর একাত্মক বা সমানাত্মক (homogeneous) হইল না; তাহা যতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, সেই স্থানের তাবৎ অংশে তাহা এক-সমান হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহার এক অংশ অন্য অংশের ঠিক সজাতীয় সমান ধর্ম্মযুক্ত হইল না। তাহা একটা সংগত পদার্থ হইল; তাহার সংলগ্নতার মধ্যে বিচ্ছেদ আছে এবং স্থায়ীই হউক বা পরিবর্ত্তনশীলই হউক, তাহার সন্নিবেশের একটি প্রণালী আছে।

এই শেষোক্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট অণুকেই আমরা অণু বলিয়া গ্রহণ করিলাম, কারণ প্রত্যক্ষ ঘটনারাশির সঙ্গে অণুর এই প্রকৃতির বেশ মিল পাওয়া যায়। এখন আমরা বস্তু সকলের রচনা প্রণালীর প্রতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিয়া অণুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

পদার্থ—যৌগিক ও রূঢ়িক।

পদার্থ দুই প্রকার, যৌগিক ও রূঢ়িক। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা হইতে আমরা ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি—

ইহাদিগকে যৌগিক পদার্থ কহে। কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহা হইতে আমরা ভিন্ন পদার্থ বাহির করিতে পারি না—ইহাদিগকে রূঢ়িক পদার্থ বা ভূত কহে। জল যৌগিক বা সংগত পদার্থ, কারণ উহা হইতে আমরা দহক ও অজনক (প্রচলিত ভাষায়, অম্লজান ও উদজান) বাহির করিতে পারি। দহক রূঢ়িক পদার্থ কেন না, উহা হইতে দহক ভিন্ন আর কিছুই বাহির করিতে পারি না। অজনকও ঐরূপ রূঢ়িক পদার্থ।

ভূত সংখ্যা। পূর্ব্বে ইউরোপে চারি প্রকার ভূত গণনা করিত; যথা, ক্ষিতি, অপ্, বায়ু ও বহ্নি। ভারতবর্ষে ব্যোমকে লইয়া পঞ্চভূত গণনা করিত। কিন্তু আমরা এখন আর ঐ প্রথম তিনটীকে ভূত বলিয়া গণনা করিতে পারি না, যেহেতু আমরা উহা-দিগকে এখন বিযুক্ত করিতে পারি। আর, বহ্নি ও ব্যোমকে ভারবান পদার্থের সহিত সমসূত্রে ধরা উচিত নহে। কিন্তু এই যে পৌরাণিক পঞ্চভূতের মত, ইহা দ্বারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছিল বলিতে হইবে, যেহেতু

ইহা পদার্থ সমূহের মধ্যে যৌগিক ও রূঢ়িক বলিয়া দুই প্রকার ভেদ স্থাপন করিয়াছিল। ইহার ভাবটা সত্য ছিল, কিন্তু ইহার ছাঁচটায় অর্থাৎ ইহার আকারে ভ্রম ঘটিয়াছিল—অর্থাৎ ঐ পাঁচটী যে ভূত সেই বিষয়ে ভ্রম হইয়াছিল।

আজিকার দিনে সত্তরটী * ভূত বা রূঢ়িক পদার্থ গণনা করা যায়; তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করে—ধাতু এবং উপধাতু। কিন্তু এমন কোন লক্ষণ নাই, যাহা দ্বারা উভয়শ্রেণীর মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করা যায়; উহাদিগের মধ্যে এমন পদার্থ আছে, যাহা উভয় শ্রেণীতেই বসে। তথাপি সচরাচর পনেরটীকে উপধাতুর মধ্যে এবং অবশিষ্টগুলিকে ধাতুর মধ্যে গণ্য করা যায়।

প্রয়োজনীয় কতকগুলি রূঢ়িক পদার্থের তালিকা—

(১) উপধাতু বা অধাতব।

১। দহক Oxygen

২। অম্লজনক Hydrogen

* লেখক ৬৪ ভূত লিখিয়াছিলেন; তাহার উপর ৬টী ভূত আবিষ্কৃত হওয়াতে আমরা ৭০ ভূত লিখিয়া দিলাম।

৩।	মরুতক	Nitrogen
৪।	অঙ্গার	Carbon
৫।	গন্ধক	Sulphur
৬।	সোমক	Selenium
৭।	ভৌমক	Tellurium
৮।	হরিতক	Chlorine
৯।	অরুণক	Bromine
১০।	রোহিতক	Iodine
১১।	দীপক	Fluorine
১২।	স্ফুরক	Phosphorus
১৩।	আলক	Arsenic
১৪।	বোরক	Boron
১৫।	শিলিক	Silicon

(২) ধাতব।

১।	পত্রক	Potassium
২।	সর্জ্জ	Sodium
৩।	খটিক	Calcium
৪।	মগ্নক	Magnesium

৫।	ফটিক	Aluminium
৬।	লৌহ	Iron or Ferrum
৭।	ক্রোমক	Chromium
৮।	নিকেল	Nickel
৯।	দস্তা বা যশদ	Zinc
১০।	রঙ্গ	Tin
১১।	সীসক	Lead or Plumbum
১২।	বস্নমৎ	Bismuth
১৩।	অঞ্জন	Antimony
১৪।	তাম্র	Copper or Cuprum
১৫।	পারদ	Mercury
১৬।	রজত, রৌপ্য	Silver or Argentum
১৭।	হিরণ্য, স্বর্ণ	Gold or Aurum
১৮।	প্লবঙ্গ	Platinum

সংগত বা যৌগিক পদার্থের দৃষ্টান্ত।

যুক্ত হইয়া এই সকল ভূত নানা প্রকার সংগত পদার্থ প্রস্তুত করে। ইহারা দহকের সহিত যুক্ত হইয়া দগ্ধীন (oxide) প্রস্তুত করে; যেমন, পত্রকের দগ্ধীন পত্রিকা

(Potash), সর্জ্জের সর্জ্জিকা (Soda), খটিকের খটিকা বা চূর্ণ; যেমন লৌহের, সীসার, রৌপ্যের দগ্ধীন ইত্যাদি।

গন্ধকের সহিত ইহারা গন্ধীন (Sulphide) প্রস্তুত করে; যেমন লৌহের গন্ধীন, রাঙের গন্ধীন, ইত্যাদি।

হরিতকের সহিত ইহারা হরিতীন (Chloride) প্রস্তুত করে; যেমন মরুতকের হরিতীন, সর্জ্জের হরিতীন—যাহা আহার্য্য লবণ, লৌহের হরিতীন, পারদের হরিতীন—যাহা ক্যালোমেল, রৌপ্যের, হিরণ্য বা স্বর্ণের, প্লবঙ্গের (Platinum) হরিতীন ইত্যাদি। এইরূপ আরও অনেক প্রকার সংগত পদার্থ প্রস্তুত হয়।

ধাতু সকল যখন পরস্পর যুক্ত হয়, তাহাকে কলাই বলে। দ্রাবক (Acid) সকল দগ্ধীনের সহিত যুক্ত হইলে লবণ প্রস্তুত হয়—যথা মরুতিম পত্রক (Potassic Nitrate) অর্থাৎ সোরা; মরুতিম সর্জ; মরুতিম তাম্র, মরুতিম রৌপ্য ইত্যাদি।

উদ্ভিদ্ পদার্থ, যাহা এত বিভিন্ন প্রকার, তাহা প্রায় কেবল দহক, অঞ্জনক এবং অঙ্গার এই তিন ভূতের ভিন্ন পরিমাণ যোগে উৎপন্ন হয়। আর, জান্তব পদার্থ মাত্র এই তিনটি ব্যতীত মরুতককেও (প্রচলিত ভাষায় যবক্ষারজান) ধারণ করে; জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থে এতদতিরিক্ত কখন বা গন্ধক, কখন বা স্ফুরক, কখন বা খটিক, এবং অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে অন্যান্য ভূতও থাকে।

পূর্ব্বোক্ত সংগত পদার্থের মধ্যে যে সকল ভূত থাকে, তাহাদের প্রতি অণুতেও সেই সেই উপাদান-ভূত থাকে। আমাদের আহার্য্য লবণের অণুতে হরিতক ও সর্জ আছে; উদ্ভিদ্‌সূত্রের অণুতে দহক, অঞ্জনক ও অঙ্গার আছে; মাংসপেশীর সূত্রের অণুতে দহক, অঞ্জনক, অঙ্গার এবং মরুতক আছে।

পরমাণু সকল সংলগ্ন থাকে না।

একাধিক ভৌতিক পরমাণু উপাদান দ্বারা অণু রচিত হয়, কিন্তু তাহারা যে পরস্পরে সংলগ্ন অর্থাৎ পরস্পরকে একেবারে ছুঁইয়া থাকে তাহা নহে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন-

বিজ্ঞান, করকাবিজ্ঞান, (Crystallography) জীবন-বিজ্ঞান, (Physiology) সকলই প্রমাণ করে যে উহারা পরস্পর হইতে পৃথক এবং দূরে অবস্থিত।

অণু সকলও পরস্পর অসংলগ্ন।

সেইরূপ আবার যখন অসংখ্য অণু একত্র হইয়া অতি ক্ষুদ্র দৃশ্যমান রেণু-কণা প্রস্তুত করে, সেই সকল অণু যে-পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু উহারা সর্ব্বতোভাবে পৃথক এবং দূরে দূরে অবস্থিতি করে।

এখন, একটা বৃহৎ পদার্থেরও যেরূপ গঠন, তাহার রেণুরও সেই একই গঠন। সুতরাং পদার্থেরা শেষফলে পরস্পর-অসংস্পৃষ্ট অণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং সেই অণুরা আবার পরস্পর-অসংস্পৃষ্ট ভূত-পরমাণুর সমষ্টিমাত্র।

রূঢ়িক ও যৌগিক পদার্থের প্রভেদ।

আমরা সংগত পদার্থ এবং তাহাদের অণুদের বিষয় যাহা বলিলাম রূঢ়িক পদার্থেও তাহাই সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। রূঢ়িক পদার্থের গঠন সংগত পদার্থের গঠন হইতে কোন বিশেষ লক্ষণ দ্বারা পরিচিহ্নিত হয় না; কেবল রূঢ়িক

পদার্থের অণুতে অসবর্ণ ও অসদৃশ ভূতের পরিবর্ত্তে সবর্ণ ও সদৃশ ভূতের সংস্থান থাকে।

আণবিক ক্রিয়া—আকর্ষণ ও বিকর্ষণ।

পদার্থ সমূহের এখন আমরা যে সকল গুণ দেখিতে পাই, তাহার কিছুই থাকিত না যদি উপকরণের ভূত সকল পরস্পরের উপর নির্ভর না করিত ও সর্ব্বথা স্বতন্ত্র থাকিত; তাহা হইলে না কঠিন পদার্থ থাকিত, না তরল পদার্থই থাকিত, সমস্ত ভূমণ্ডল কেবল বায়বীয় হইয়া থাকিত,—না তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বাঁধাবাঁধি থাকিত, না তাহাদের কোন আকার প্রকার থাকিত—কেবল এক স্থিতিরোধকতা দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিতে থাকিত, এই মাত্র। অতএব জড় পদার্থের ভূত সকল পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সম্বদ্ধ। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ শক্তি উহাদিগের মধ্যে কার্য্য করিয়া উহাদিগকে পরস্পর হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ দূরে রাখিতেছে; পদার্থদিগের আকার, গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত করিয়া দিতেছে। এই শক্তিদ্বয় আণবিক ক্রিয়া নামে খ্যাত।

কঠিন পদার্থ উত্তাপকে আপনার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় এবং সেই সঙ্গে তাহার আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সুতরাং উঁহাদিগের অণু সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে না, কারণ, তাহা হইলে শীতল হইলে তাহারা পুনরায় সঙ্কুচিত হইত না। তবে এই বলিতে হইবে যে, উত্তাপের পরিমাণ অনুসারে উহারা আপনা-দিগের আণবিক আকর্ষণ শক্তি এবং উহাদিগের মধ্য-স্থিত সেই উত্তাপের বিকর্ষণ শক্তি (যাহা আয়তনকে ক্রমিকই বর্দ্ধিত করিতে ও অণুদিগকে ক্রমাগতই দূরে লইয়া যাইতে চাহে), এই উভয় শক্তি দ্বারা এক এক সামঞ্জস্যধারা প্রস্তুত করিয়া লয়। কঠিন বস্তুর দৃঢ়তা, জমাটবদ্ধভাব, আঁকড়াইয়া থাকার ভাব এবং আর আর গুণ সকল, যাহা উত্তাপের সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয়, উহারা আণবিক সাম্যভাবের ফলমাত্র।

যে ভাব থাকিলে কাঠিন্য বলা যায়, তরল পদার্থে অণুসকলের সেরূপ অচল ভাব থাকে না, উহারা আপনাদিগের ভিতর চলিয়া বেড়ায়; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কতক পরিমাণে জমাটবদ্ধ ভাবের ব্যাঘাত

হয় না। যদি পাত্রের কাণায় বা পাতার আগায় এক ফোঁটা জল ঝুলিয়া রহিয়াছে মনে করা যায়, সেই ফোঁটায় অণুরা পরস্পরের উপর যে আকর্ষণ প্রয়োগ করে, তাহারই দ্বারা তাহার নীচের অর্দ্ধভাগ উপরের অর্দ্ধভাগে লাগিয়া থাকে।

বাতাসে এবং বায়বীয় পদার্থে অণুসকলের আপনাদের মধ্যে আপেক্ষিক সচলতা আরো অধিক। তাহাদের বিশেষ লক্ষণ এই যে তাহাদের আকর্ষণী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের অণু সকল অবিরত অধিকাধিক দূরে যাইতেই চেষ্টা করে, অধিকতর আয়তন ধারণ করিতে চায়। তাহাদের এক অনির্দ্দিষ্ট প্রসারণ শক্তি আছে। যদি তাহাদিগকে দশ গুণ, শত গুণ বা সহস্রগুণ অধিকায়তন স্থানে বিস্তৃত হইতে দেওয়া যায়, তখনো তাহারা আরও প্রসারিত হইতে চেষ্টা করে এবং যে পাত্রের মধ্যে তাহারা থাকে, যে পাত্র তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সেই পাত্রের পরদায় (গাত্রে) তাহারা চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে।

বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা।

এই চাপই তাহাদিগের প্রসারণ শক্তির বা স্থিতিস্থাপক শক্তির পরিমাণ। এই চাপ সর্ব্বদাই আছে কিন্তু উহার পরিমাণ অত্যন্ত বিভিন্ন। বাতাসকে যতই সংকুচিত করা যায়, যে পরিমাণে তাহার আয়তনকে ক্ষুদ্র করা যায়, যতই অপ্রশস্ত স্থানে তাহাকে ঠাসিয়া রাখা যায় ততই তাহার চাপ বা স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। বায়ুর পিচকিরি দ্বারা (১৬শ চিত্র) তাহা সপ্রমাণ হয়। বায়ুকে যত মুক্ত ভাবে আপনার আয়তন বৃদ্ধি করিতে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, ততই তাহার চাপ ও স্থিতিস্থাপকতা কমিতে থাকে।

১৬শ চিত্র।

পদার্থ সমূহের লক্ষণ।

অণু সমূহের স্থায়ী ভাব, অটল ভাব কঠিন পদার্থের লক্ষণ; অণুসমূহের অপেক্ষাকৃত সচলভাব তরল পদার্থের লক্ষণ; অণুসমূহের প্রসারণ মরুৎ পদার্থের লক্ষণ।

যাহা দ্বারা বস্তুর রচনাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত

হয় না, প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে কেবল সেই সকল আণবিক ক্রিয়া সমালোচিত হয়; যে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন ভূতের যোগাযোগ নিয়মিত হয়, তাহারা রসায়ন বিজ্ঞানের বিষয়।

শব্দবিজ্ঞান।

শব্দোৎপত্তি, শব্দ-বিস্তার ও শব্দ-বোধ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইবে, সকলই শব্দবিজ্ঞানের অন্তবর্ত্তী।

শব্দোৎপত্তিতে ব্যবধান আবশ্যক।

শব্দশীল বস্তুমাত্রই বাতাসে, অথবা সেই বস্তু ও আমাদের মধ্যে যে ব্যবধান, সেই ব্যবধানে যাতায়াত গতিবিধান করে। এই গতি কখন হেলনাকারে, কখন দোলনাকারে কখন বা প্রকম্পন এবং কখন বা স্পন্দনাকারে হইয়া থাকে।

শব্দ কি প্রকারে শ্রুত হয়?

যখন কোন বাদ্য যন্ত্রের তন্ত্রী অঙ্গুলি-স্পর্শ দ্বারা প্রকম্পিত হয়, বাতাস ক্রমে পরে পরে তাহার সেই গতি প্রাপ্ত হয়; বাতাস ঐ গতিকে আবার কর্ণপটহে সঞ্চারিত করে, কর্ণ-পটহ উহাকে শ্রবণ-স্নায়ুতে প্রচার করে। এইরূপে

দেখ, বাতাসের মধ্যস্থতাতে শ্রবণ-স্নায়ুর ও সম্পন্ন তন্ত্রীর যোগাযোগ রক্ষিত হয়। ইহা দ্বারা শ্রবণ-স্নায়ু যেন ঐ তন্ত্রীর সহিত একভাব ধারণ করে, উহার সর্ব্বপ্রকার গতির ভাগী হয়। তন্ত্রী মুহূর্ত্তে শত বা সহস্রবার স্পন্দন করিলে ইহাও তত বার স্পন্দন করিবে এবং তন্ত্রীর বিশ্রামস্থান হইতে স্পন্দনের অধিকতর বা অল্পতর প্রসার্য্যতানুসারে স্নায়ুও অধিক বা অল্প প্রসরে স্পন্দিত হয়।

শব্দ বলিতে কি বুঝায়?

শব্দে আমরা দুই প্রকার ঘটনা দেখিতে পাই—এক, স্বনবান্ পদার্থের ও বাতাসের স্পন্দন, এবং দ্বিতীয়, ইহার ফলস্বরূপ শব্দজ্ঞান। যদিও প্রধানত শব্দজ্ঞানকেই শব্দ বলে, পরন্তু তাহার কারণকেও, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাহিরে যে স্পন্দনশীল গতি হয় তাহাকেও শব্দ বলা যায়।

মন্দ ও দ্রুত স্পন্দনে মন্দ্র ও তারস্বরের উৎপত্তি।

শব্দের তীক্ষ্ণতা শ্রবণ-স্নায়ুর স্পন্দনের প্রসারের উপর, সুতরাং মূলে বাহিরের শব্দায়মান পদা-

র্থের প্রকম্পন-প্রসারের উপর নির্ভর করে। মন্দ স্পন্দনের সহিত মন্দ্রস্বর ও দ্রুত স্পন্দনের সহিত তারস্বরের সমাবেশ হয়। মধ্য স্বরগ্রামের ধা স্বর (Diapason) মুহূর্ত্তে ৮৭০ বার একধাস্পন্দনের সমতুল্য (একধাস্পন্দন বলিতে প্রত্যাবর্ত্তন বিনা কেবল গমনকেই বুঝায়।) আর, আর্গিনের (organ) সর্ব্বাপেক্ষা খাদের সুরে ৬৪টী একধাস্পন্দন মাত্র হয়। মনুষ্যের খাদসুরে ৩৯৬ এবং শিশুর চীৎকারে মুহূর্ত্তে ২০০০ অপেক্ষাও অধিক একধা-স্পন্দন হয়।

স্পন্দনের অনুভব-প্রণালী।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন নানা প্রকারে বোধগম্য হয়। একটা ঘণ্টা বা যে কোন শব্দায়মান কঠিন পদার্থ হউক, তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা অত্যন্ত লঘুভাবে স্পর্শ করিলে এক প্রকার কম্পন-বিশেষ উপলব্ধ হয় এবং উহাকে চাপিলেই কম্পন ও ধ্বনি উভয়ই এককালে থামিয়া যায়।

স্পন্দন-তরঙ্গের আকার।

যদি পায়াবিশিষ্ট ও অর্দ্ধজল বা পারদপূর্ণ কাচপাত্রের মুখে বাদ্য-

যন্ত্রের ধনুক দিয়া টানা যায়, তাহা হইলে বিশেষ নিয়মানুসারে কখন মন্দ্রতর, কখন তারতর ধ্বনি কর্ণগোচর হয়। আবার সেইক্ষণে তরল পদার্থের উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ বা আন্দোলন দ্বার লাঙ্গলপ্রদ্ধতির ভাব ধারণ করে। এই আন্দোলন নেমিদেশ হইতে নাভিবিন্দুতে প্রচারিত হয়। এই তরঙ্গমালা এক রকমে ঐ কাচ-পাত্রের স্পন্দন-ঠাট আঁকিয়া দেয়। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্পন্দনাংশ সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট হয়—যেমন, ৪, ৬, ৮; এবং ঐ স্পন্দন-ঢেউ যত অধিক সংখ্যক হয়, ধ্বনি তত উচ্চ হয়।
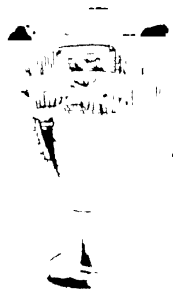
১৭শ চিত্র।

আকার, দ্রব্য ও শব্দগত প্রভেদ যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপে স্পন্দনশীল পদার্থমাত্রেই বহুতর তরঙ্গপরম্পরায় বিভক্ত হয়। এই তরঙ্গমালা বিশ্রাম-

রেখা দ্বারা পরস্পর হইতে পৃথক্ হয়। এই বিশ্রাম-রেখাকে সন্ধিরেখাও বলে বা কেবল গ্রন্থিও বলে। নিম্নলিখিত চিত্র দ্বারা সমচতুর্ভুজ পাতের কতকগুলি
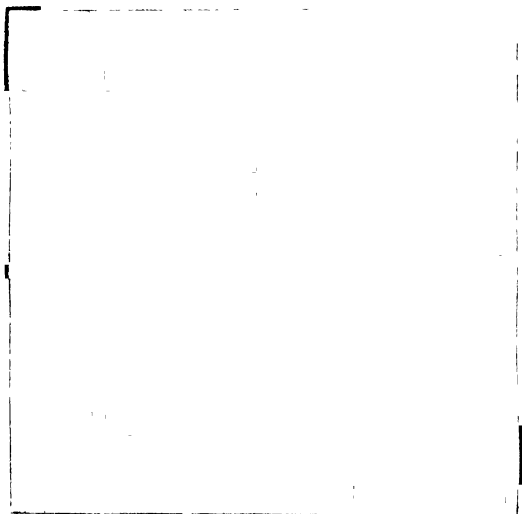
১৮শ চিত্র।

স্পন্দন-প্রকার দেখিতে পাওয়া যাইবে। ৩৬টী সমচতুর্ভুজ পাত আছে। ইহাদের মধ্যে শ্বেতবিন্দু দ্বারা সরল, বক্রাকার ও অসমান (irregular) গ্রন্থিরেখা দেখান যাইতেছে। এই ছবিতে যে সকল অদ্ভুতাকার

গ্রন্থিরেখা দৃষ্ট হইতেছে, তাহা দ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইতেছে যে, ৬ বা ৮ ইঞ্চি বাহুপরিমিত ও $\frac{১}{২৫}$ বা $\frac{২}{২৫}$ ইঞ্চি পুরু কাচ বা ধাতুময় একই পাত্রের অণু সকল কি সহজভাবে অত্যন্ত বিসদৃশ স্পন্দনাবস্থায় পরিণত হয়।

এইরূপ অসংখ্য বিভিন্নাকার স্পন্দন উৎপাদন করিবার জন্য পাতকে চক্রবাট্‌ভাবে (horizontally) চিমটা দ্বারা রক্ষা করিতে হয়। চিমটা আপনার দুই মুখ দ্বারা উহার দুই পৃষ্ঠায় দুই বিন্দু চাপিয়া ধরে। তাহার পরে বাদ্যযন্ত্রের ধনুক দ্বারা পাতের কোন এক বিন্দুতে টানিতে থাকিলে এবং ঐ পাতের উপর বালুদানা সকল রাখিলে ঐ বালুদানাগুলি স্পন্দন দ্বারা গতিযুক্ত হইয়া সরিতে সরিতে ও নাচিতে নাচিতে সহস্ররূপে স্থানান্তরিত হইয়া গ্রন্থিরেখায় আসিয়া একত্র হয় এবং এইরূপে গ্রন্থির গঠন অঙ্কিত করে। গ্রন্থিরেখাসকল বিভিন্ন ধ্বনির সম্বন্ধে বিভিন্ন আকার ধারণ করে; ইহাতে সহজে জানা যায় যে, দোলন ক্রিয়া গ্রন্থিরেখার আশপাশে সম্পাদিত হয়—

এমনিভাবে সম্পাদিত হয় যে, পাত এক পাশে উঠে আর এক পাশে নামে। এই দুই ভিন্নপ্রকার গতি গ্রন্থিরেখাঙ্কিত স্থানকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

শব্দস্পন্দনের বিস্তৃতি।

জড় পদার্থের বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দারা তাহার অভ্যন্তরস্থ গতি সাধারণরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। কতকগুলি পরমাণুসমষ্টিকে দ্রব্য কহে। ঐ পরমাণু সকল পরস্পর পৃথক্ ও দূরে থাকিয়াও পরস্পরকে নিরন্তর চায় এবং তাহাদিগের পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সাম্যভাবে অবস্থান করে। ঐ দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্রতম অংশও চাপ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ সেই চাপকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়; চতুর্দ্দিকস্থ অংশ সকল আবার উহাকে আপনাদিগের চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত করে এবং এইরূপে ঐ চাপ ক্রমে ক্রমে দ্রব্যের সীমা পর্য্যন্ত চলিয়া আসে। কিন্তু ঐ দ্রব্যটী শূন্যের মধ্যে পৃথগবস্থিত নাই; ইহা অন্যান্য আশ্রয়, অন্যান্য জড় পদার্থরাশি অবলম্বন করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারাও ইহার পারমাণবিক গতির অংশী হয়।

তথাপি এই সকল চাপ একক্ষণে সম্পন্ন হয় না। কোন চাপের দান আদান অল্পক্ষণের মধ্যে হইলেও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হওয়া চাই। এই সময়ের তারতম্যে স্বনবান্ দ্রব্য সকল স্পন্দ-ঢাল ও বিশ্রাম-রেখায় বিভক্ত হয়। এইরূপে সকল স্পন্দনশীল গতি দূরে প্রচারিত হয়; কেবল যে দ্রব্যে উহা উদ্ভূত হইয়াছে সেই দ্রব্যেই যে সঞ্চারিত হয় তাহা নহে কিন্তু ক্রমে নিকটস্থ সমুদয় পদার্থরাশিতে তাহা সঞ্চারিত হয়। স্পন্দনগতির মাত্রা ও তাহার সঞ্চারগতির সময়ের যোগে ঐ সকল পদার্থরাশি প্রথমকম্পিত পদার্থের প্রকম্পনকে এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীপরম্পরায় ও সময়ক্রমে আবৃত্তি করে।

ক্ষুদ্র হাতুড়ি, যাহা ঘড়ির ঘণ্টিকে আঘাত করে, তাহা ঘণ্টির অতি অল্প স্থান মাত্র স্পর্শ করে অথচ সমস্ত ঘড়ি ও তাহার আধার উহার গতি প্রাপ্ত হয়। তেমনি যে দণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টাকে আঘাত করে, তাহাও ঘণ্টার অল্প স্থানই স্পর্শ করে, অথচ সমুদয় ঘণ্টা আন্দোলিত হয়। তদ্দারা কেবল যে ১০।২০ মাইল

দূর পর্য্যন্ত বায়ু কম্পান্বিত হয় তাহা নহে; কিন্তু যে সকল আধার ঐ ঘণ্টাকে ধারণ করিয়া থাকে তাহারাও ঐ গতি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও স্পন্দিত হইয়া সেই স্পন্দনকে বাটীর মেজে (গৃহতল), প্রাচীরতলস্থ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত প্রচার করে; আবার তাহারা নিজ নিজ দৃঢ়তা, কোমলতা, নিজ নিজ স্থিতিস্থাপকতাভেদে ঐ স্পন্দন-গতিকে যথাযোগ্যরূপে প্রচার করে।

আলোক।

আলোকের কার্য্য। আলোক দূরস্থ দ্রব্যের আকার ও তাহাদের দৃশ্যমান আয়তন জানায়। যখন আমরা কোন গাছ বা বাড়ী বা পর্ব্বতের দিকে তাকাই, যখন আমাদের দৃষ্টি দৃষ্টিসীমায় আবদ্ধ হয়, তৎক্ষণাৎ তথাকার পদার্থচয়ের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; উক্ত পদার্থচয়কে কেবল বাহ্য পদার্থমাত্র বলিয়া জানি না, কিন্তু এমন বাহ্যপদার্থ বলিয়া জানি, যাহার আকার, প্রভা, বর্ণ, পারস্পরিক অবস্থান ও দূরতা আমরা এককালীন অনুভব করি।

আলোকেরই প্রসাদে বাহ্যজগৎকে আমরা এমন

সত্বর, এমন পূর্ণরূপে, আশ্চর্য্য রূপে জানিতেছি। আলোকের দ্বারাই আমরা আকাশকে স্পর্শ করি; কিন্তু ইহা সেই অন্ধকার আকাশ নহে, যাহা আমরা অধ্যাহার করিয়া জানি; ইহা সেই শূন্য জ্যামিতিক আকাশও নহে, যাহা দৃষ্টিহীন ব্যক্তিও অনুভব করে; কিন্তু ইহা সেই বাস্তবিক আকাশ; যাহা জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, যাহা পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, এবং যাহা তেজঃপুঞ্জ লোকমণ্ডলে পরিপূর্ণ থাকিয়া অন্তরীক্ষের শোভাসম্পাদন ও বিশ্বপতির মহিমা ঘোষণা করে।

সৌরজগৎপ্রণালীর আভাস।

কি আশ্চর্য্য সহজ প্রণালীতে এই ব্যাপার সম্পন্ন হয়, সংক্ষেপে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। পৃথিবী একটী গোলাকার পদার্থ; ইহার ব্যাস প্রায় ৭৯৩৮ মাইল। ইহাকে ভূলোক বলে। ইহা প্রায় ৫০। ৬০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ু দ্বারা আবৃত*—এই স্থানকে ভুবলোক

* কাহারও কাহারও মতে ৫০০ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুর অতি সূক্ষ্ম অবস্থায় অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

বলে। এই বায়ুসীমার ঊর্দ্ধে স্বর্লোকের আরম্ভ। মনে চিন্তা কর, এই আকাশ সকল স্থানেই প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে—উচ্চে আমাদের মস্তকের উপরে, গভীরতায় আমাদের পদতলের নিম্নে এবং আমাদের সমুদয় আশেপাশে সমভাবে অমিত ও অসীমরূপে বিস্তৃত আছে। আরো মনে কর, আমাদের পৃথিবী-গ্রহসদৃশ বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর অন্যান্য গ্রহ সকল পৃথিবীর ন্যায় আকাশে থাকিয়া ইহাদের সাধারণ কেন্দ্র সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট বা ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। যে গ্রহ এই মধ্যবিন্দুর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা প্রায় চারি কোটী আশি লক্ষ মাইল পরিমিত কক্ষরেখা (orbit) অঙ্কিত করিতেছে। যে গ্রহ অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, তাহা পৃথিবীর কক্ষরেখা অপেক্ষা ৩০ গুণ বৃহৎ কক্ষরচনা করিতেছে অর্থাৎ প্রায় ৩৬০ কোটী মাইল পরিমিত অরবিশিষ্ট চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে। এইরূপে আমরা যাহার অন্তর্ভূত আছি, সেই সৌরজগৎপ্রণালীর আভাস প্রাপ্ত হইলাম।

সূর্য্য সৌরজগতের আলোক-কেন্দ্র।

সূর্য্য কেবল সৌরজগতের মধ্যবিন্দু এবং তাহার গতি ও ক্রিয়ার কেন্দ্র-মাত্র নহে, ইহা ঐ জগৎমণ্ডলের আলোকেরও কেন্দ্র ও আধার। চারি শতাবধি * জ্ঞাত গ্রহ এবং তাহাদের অধীনস্থ উপগ্রহ এবং শত শত ধূমকেতু, এই সকলই সূর্য্যেরই জ্যোতিতে দীপ্তি পায়; এবং চন্দ্র ও পৃথিবীর ন্যায় এই সকল গ্রহ প্রভৃতির যে অর্দ্ধখণ্ড সূর্য্যের অভিমুখে থাকে তাহাই দীপ্তি পায়, অপর অর্দ্ধাংশ রজনীর অন্ধকারে আবৃত থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডের নিকট সৌর-জগৎ একটী বিন্দু।

আমাদের মানসচক্ষুর সমীপে যাহা এমন প্রকাণ্ড বলিয়া বোধ হইতেছে, জ্যোতিষশাস্ত্র যাহাকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না, সেই এই সৌরজগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধে একটী বিন্দু—একটী অদৃশ্য বিন্দু মাত্র। যাহাদের আকার, গঠন ও নিয়মাবলী আমাদের নিকট এই সৌর-জগতেরই সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, এমন অসংখ্য জগৎ

* লেখক লিখিয়াছিলেন "শতাবধি"; বর্ত্তমানের আবিষ্কারানুযায়ী আমরা "শতাবধি" শব্দের পূর্ব্বে "চারি" সংযুক্ত করিয়া দিলাম।

আকাশগহ্বরে অবস্থান করিতেছে। আকাশস্থিত প্রত্যেক নক্ষত্র সূর্য্যের ন্যায় আলোকের এক একটী মধ্যবিন্দু এবং গতি ও ক্রিয়ার কেন্দ্র বলিয়া উপলব্ধ হয়। উহারা প্রত্যেকে ঈশ্বরদত্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে আমাদের সৌরজগতের গ্রহধূমকেতুসদৃশ নিজ নিজ অধীনস্থ তারকা প্রভৃতিকে শাসনে রাখিতেছে।

যেমন পৃথিবীস্থ পদার্থ সকল যত দূর হইতে দূরে গিয়া দৃষ্টিসীমার নিকটবর্ত্তী হয়, তত অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অবিষয় হইয়া দৃষ্টির বিষয়মাত্র হইয়া থাকে; তেমনি এই সমস্ত অসংখ্য জগৎ আলোকরশ্মি বর্ষণ দ্বারা কেবল দৃষ্টির বিষয় মাত্র হইয়া আমাদিগের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হয়। অসীম দূরতাবশতঃ তাহাদিগকে অসীম ক্ষুদ্র দেখায়। নক্ষত্ররাজির মধ্যে লুব্ধক (sirius) নামক নক্ষত্রকে অন্যান্য নক্ষত্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর দেখায়। ইহাকে খালি চক্ষেও যেমন একটী বিন্দু বলিয়া বোধ হয়, তেমনি যে দূরবীন কোন আয়তনকে লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে সেই দূরবীণ

দিয়া দেখিলেও উহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেখায় না। কিন্তু আমরা ঠিক্ জানি যে, লুব্ধক নক্ষত্রের স্থানে আমাদের এই সূর্য্য যাইলে তাহাকেও তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষা হীনপ্রভ ক্ষুদ্র বিন্দুর মত দেখাইত।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশিসদৃশ যে তারকাসমূহ আকাশগভীরে বিছাইয়া আছে, ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী দূরতা যে কত, জ্যোতির্বিদ্যা তাহা এখনো নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা এ বিষয়ে এই একটী মাত্র জানিয়াছি যে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে তারকা, পৃথিবী হইতে উহার ব্যবধান পৃথিবী হইতে সূর্য্যের ব্যবধানের অথবা নয় কোটী মাইলের তিন লক্ষ গুণেরও অধিক। ইহা দ্বারা জগতের সীমা কোথায় তাহা বুঝিতে পারি না, কিন্তু পরমেশ্বর বিশ্বমণ্ডলের যে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষুদ্র চক্ষুর আয়ত্তাধীন করিয়া দিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারি। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছি, অন্তরীক্ষগত জড়জগৎ-শৃঙ্খলা এইরূপ।

আকাশ। মুহূর্ত্তের জন্য সৌরজগতে পুনরায়

প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। সূর্য্য এবং গ্রহগণের মধ্যবর্ত্তী স্থান জড়পদার্থসংগঠিত নহে; পৃথিবী বা বায়ু যেমন ভারবান্ জড়পদার্থে নির্ম্মিত অথবা নীরেট ও ভারী গ্রহ সকল যেরূপ পদার্থে সংরচিত হইয়াছে, এই মধ্যবর্ত্তী স্থানে তেমন কোন কিছু নাই; আমরা ইহাকে আকাশ বা শূন্য বলিব। আমরা কোন্ অর্থে আকাশকে গ্রহণ করিলাম ইহা বুঝা আবশ্যক। যে স্থানে ভারবান্ বা তুলবান্ বস্তু না থাকে; সেই স্থানকে শূন্য কহে। এখন, গ্রহ সকল বিনা বাধায় তাহাদের সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। তাহারা এমন কোন পদার্থ সম্মুখে পায় না, এমন কাহাদের সহিত তাহাদের ঠেকাঠেকী হয় না, যাহাতে তাহাদের সময়ের নিয়মে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ধূমকেতু সকল, যাহাদের দ্রব্যরাশি অতুলন পরিমাণে অল্প এবং আয়তন অতুলন পরিমাণে অধিক, তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় সাক্ষ্য দিতেছে যে পদার্থ সকল সর্ব্বত্র সমভাবে নাই, কিন্তু তাহারা গ্রহমণ্ডলে এবং অস্থির, পরিবর্ত্তন-

শীল ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ডে সংহতভাবে রাশীকৃতরূপে একত্র অবস্থিত আছে। অতএব তারকা ও গ্রহগণের অবাধ গতিই উহাদের মধ্যগত স্থানের শূন্যতা অর্থাৎ তথায় অসম্বদ্ধ পদার্থরাশির অসদ্ভাব প্রমাণ করিতেছে।

কিন্তু জগৎ দুই উপকরণে রচিত—এক, তারকাগণ যে পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত অর্থাৎ ভারবান্ উপকরণ; দ্বিতীয়, ভারহীন উপকরণ, যাহাকে আকাশ বা ব্যোম (ether) কহে। এই ব্যোম যেমন পৃথিবীর সমুদয় স্থান জুড়িয়া আছে, তেমনি অন্তরীক্ষগত স্থানও জুড়িয়া আছে,—যাহার মধ্যে সৌরজগৎ আপনার গতিক্রিয়া সম্পন্ন করে কেবল সেই স্থান নহে, কিন্তু অন্যান্য সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী শূন্য, যাহা আমাদিগের হইতে আকাশগহ্বরের অত্যন্ত গভীরগত তারাসমূহকে পৃথক্ করে, ইহা সেই শূন্যও পূর্ণ করিয়া থাকে; প্রত্যুত ইহা সমুদয় পূর্ণ করিয়া থাকে, ইহা কেবল পদার্থের উপরিভাগে বদ্ধ নাই; ইহা বস্তু ভেদ করিয়া, স্থিতি করিতেছে। কোন এক

সামগ্রীর মধ্যে রূঢ়িক বস্তু সকলকে যে ব্যবধান পৃথক্ করে, ব্যোম ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবধান-কেও পূর্ণ করে। যে সকল আণবিক ক্রিয়া দ্রব্যের গঠন ও রাসায়নিক যোগানুরাগ (affinity) নিয়মিত করে, সেই সকল ঘটনার মধ্যেও ইহার আংশিক প্রভুত্ব আছে। অনুক্রম তাপ, যাহা অত্যন্ত নীরেট কঠিন ও অভেদ্য পদার্থেও সংকোচ ও বিস্তার বিধান করে এবং রশ্মিময় তাপ, যদ্দারা পদার্থ সকল পরস্পরকে অনুভব করে, আপনাদিগের উষ্ণতা ও শীতলতা দূরে প্রচার করে, এই উভয়েতেই ব্যোমের কার্য্যকারিতা আছে। অতএব ব্যোম পৃথিবীর বক্ষের মধ্যে, সূর্য্যের মধ্যে, তারকার মধ্যে সর্ব্বত্রই আছে। কোন স্থানে ঐন্দ্রিয়ক বা নৈরিন্দ্রিয়ক, স্বর্গীয় বা পার্থিব এমন একটী খণ্ড অণু বা পরমাণু নাই, যাহা ব্যোম দ্বারা আচ্ছাদিত ও অনুবিদ্ধ নহে, যাহা ব্যোমের অধিষ্ঠানেই বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন হয় নাই।

আলোকের উৎপত্তি। এখন আলোক কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা এক কথায় বুঝান যাইবে। যেমন বায়ুর

স্পন্দনে শব্দের, তেমনি ব্যোমের স্পন্দনে আলোকের উৎপত্তি। শব্দ কর্ণের গ্রাহ্য, আলোক চক্ষুর গ্রাহ্য। আমরা ব্যোমের যেরূপ লক্ষণ দিলাম, তাহাতে ইহা ভারহীন পদার্থ, কিন্তু গতিহীন পদার্থ নহে বলিয়া বোধ হইবে। ইহা চঞ্চল, সংকোচ্য ও স্থিতিস্থাপক এবং ইহা যে গতি প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রচালন করিবার পক্ষে ভারবান পদার্থ অপেক্ষা অতুলন গুণে সক্ষম। ব্যোমের স্পন্দন অত্যন্ত ক্ষীণ না হইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুচালিত হইতে পারে।

এই স্পন্দন কিরূপে সম্পন্ন হয়, দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক্। এমন মনুষ্য নাই, যাহার দৃষ্টি কোন না কোন সময়ে কোন এক প্রশান্ত নদী, সরোবর বা সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ জলে সমাকৃষ্ট হইয়া বিস্মিতভাবে লক্ষ্য না করিয়াছে যে, অতি ক্ষুদ্র হিল্লোল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে সমতল জলরাশির উপরে উন্নত হইয়া পরিমিতবেগে নিকট হইতে দূরে গড়াইতে গড়াইতে বর্দ্ধমান মণ্ডলাকারে তীর পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এই তরঙ্গরাশি ক্ষণস্থায়ী, মনে করিলে

ইহাকে কালব্যাপী করা যায়। কোন একটী চোঙার মত পদার্থকে জলে ডুবাইয়া তাহাকে উঠাইলে নামাইলে তরঙ্গরাশি কালব্যাপী হয়। ইহা দ্বারা তরঙ্গ সকল যেমন ক্রমশ দূরে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, তেমনি নিয়ত নূতন জন্মাইতে থাকে। এইরূপে সমুদয় জলতল সত্বর মণ্ডলাকার তরঙ্গে বিভক্ত হয়। স্পন্দনশীল চোঙা এই সকল তরঙ্গের নাভিদেশ। জলতলের প্রত্যেক অণু পর্য্যায়ক্রমে উচ্চ নীচ হওয়াতে ঐরূপ তরঙ্গাকার লক্ষিত হয়। জল ঐ চোঙার স্পন্দনকে সম্পূর্ণ আবৃত্ত ও পুনরুদ্ভূত করে। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, যেদিকে তরঙ্গ প্রচারিত হয় সেই দিকের লম্বভাবে জলের স্পন্দনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এখন, স্পন্দমান নাভিদেশ হইতে তরঙ্গ তীরাভিমুখে অর্থাৎ চক্রবাড়্‌দিকে বিস্তৃত হয়; সুতরাং স্পন্দন ক্রিয়া ঊর্দ্ধাধোদিকে হয়।

ভারবান্ পদার্থ জলের বিষয়ে উপরে যাহা বলা গেল, তাহা হইতে ব্যোমের প্রতিক্রিয়ার স্থূল আভাস মাত্র পাওয়া যায়, ব্যোমের প্রতিক্রিয়ার অন্ততঃ

কতকটা ভাব বুঝা যায়। জলের ন্যায় ব্যোমেও স্পন্দিত গতি ক্রমে দূরে প্রসারিত হয়। ব্যোমেও স্পন্দন একটী নির্দ্দিষ্ট বেগবিশিষ্ট গতিতে প্রচারিত হয়; পরিমিত সময়ের মধ্যে স্পন্দন হয় এবং তরঙ্গের পরিমিত দৈর্ঘ্য আছে। তবে প্রভেদ এই যে, ব্যোমের তরঙ্গে মধ্যবর্ত্তী পদার্থ অত্যধিক গুণে স্থিতি স্থাপক হওয়াতে গতির বেগ অত্যধিক গুণে অধিক হইবে, কিন্তু তেমনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ও স্পন্দনের সময়টা অত্যধিক পরিমাণে ক্ষুদ্র হইবে।

দৃষ্টির কারণ।

অতএব সূর্য্যের উপরে যে সকল দীপ্তিময় পদার্থরাশি আছে, তাহারা অবিশ্রামে ও অবিচ্ছেদে ব্যোম পদার্থের মধ্যে নিরন্তর স্পন্দনক্রিয়া উত্তেজিত করে। এই স্পন্দন ক্রমে দূরে সঞ্চারিত হইয়া যতক্ষণ না উহা ভারবান্ পদার্থ কর্ত্তৃক প্রতিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ সর্ব্বদিকে অন্তরীক্ষে প্রচারিত হয়। যে সকল স্পন্দন আমাদের বায়ুমণ্ডলের সীমায় আসে, তাহারা বায়ু ভেদ করিয়া, উহার সমুদয় ঘনত্ব অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর কঠিন

মৃত্তিকাতে আসিয়া আঘাত করে। এখানে উহারা নানা পরিণাম প্রাপ্ত হয়। যে সকল পদার্থ স্পন্দন সকলকে আপনাদের মধ্য দিয়া যাইতে দেয় তাহা-দিগকে স্বচ্ছ পদার্থ কহে; যাহারা স্পন্দনের কতক অংশ শোষণ করে তাহারা অস্বচ্ছ এবং যাহারা স্পন্দনকে একেবারে নির্ব্বাণ করিয়া দেয় তাহারা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ। এমতে চক্ষু স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারাই রচিত। স্পন্দনগতি উহাকে ভেদ করিয়া স্নায়বীয় পদার্থ নির্ম্মিত দৃষ্টিপটে আঘাত দিয়া স্নায়ুজালের গুচ্ছকে কম্পিত করে। এইরূপে চক্ষুর অন্তরস্থ যে ব্যোমের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী ব্যোমের নিরন্তর যোগ আছে, সেই ব্যোমকম্পন দ্বারা আমরা জ্যোতি অনুভব করি, পদার্থদিগকে প্রভেদ করিয়া চিনি, বৃক্ষ দেখি, আকাশ আলোচনা করি। যে সকল তরঙ্গ আমাদের চক্ষুর মণিচ্ছিদ্র ভেদ করিয়া যায়, তাহারা যে কি আশ্চর্য্যকর কৌশলে চক্ষুসম্মুখস্থিত তাবৎ পদার্থের আশ্চর্য্য প্রতিমা অঙ্কিত করে, যাহা দ্বারা আমরা পদার্থ সকলকে একভাবে স্পর্শ করিয়া

স্বচ্ছ কাহাকে বলে?

দেখি ও জানি, দৃষ্টিবিদ্যার বিবরণ পাঠে আমরা তাহা অবগত হইতে পারি।

বর্ণের কারণ।

স্পন্দনগতির দ্রুতত্বানুসারে যে জ্যোতিস্তরঙ্গের দীর্ঘহ্রস্বতা হয়, তদ্দারা নানা প্রকার বর্ণ উপলক্ষিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গের সঙ্গে লোহিত বর্ণের ঐক্য এবং সর্ব্বা-পেক্ষা ক্ষুদ্র প্রবাহের সঙ্গে বেগুনী বর্ণের ঐক্য আছে। অতএব কর্ণের সম্বন্ধে যেমন মন্দ্র ও তার স্বর, চক্ষুর সম্বন্ধে তেমনি লোহিত ও বেগুনী বর্ণ। অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা দ্বারা তরঙ্গের দীর্ঘতা নির্ণীত হইয়াছে—নিম্নের তক্তিতে সেই সকল পরীক্ষা-ফলের সমষ্টি দেওয়া হইল।

বর্ণ	মিলিমেটরের অথবা ($\frac{১}{২৫}$ ইঞ্চির) নিযুতাংশ দীর্ঘ।
লোহিত	৬৪৫
নারাঙ্গী	৫৯৬
হরিদ্রা	৫৭৪
হরিৎ	৫৩২

শ্যাম	৪৯২
নীল	৪৫৯
বেগুনী	৪৩৯
গাঢ় বেগুনী	৪০৬

সূর্য্যের আলোক এবং সামান্যত শ্বেত আলোক মাত্রই পূর্ব্বোল্লিখিত তাবৎ বর্ণের যোগে উৎপন্ন হয়, সুতরাং ঐ সকল তরঙ্গের সমষ্টি দ্বারা রচিত। কোন দ্রব্যই প্রাপ্ত তরঙ্গকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, উহা কেবল তাহাদিগকে শোষণ বা নির্ব্বাণ করিয়া তাপে পরিণত করিতে পারে; যাহাদিগকে না নির্ব্বাণ করে তাহাদিগকে পুনঃ প্রেরণ করে—তাহাই আবার সেই দ্রব্যের বর্ণ হয়। যখন কোন দ্রব্য লোহিত বর্ণের তরঙ্গ অপেক্ষা অন্যান্য বর্ণের তরঙ্গদিগকে অধিক নির্ব্বাণ করে, তখনই সেই দ্রব্য লাল দেখায়। যে দ্রব্য পিঙ্গর, হরিৎ বা নীল দেখায়, তাহা পিঙ্গর, হরিৎ বা নীল বর্ণের তরঙ্গ অপেক্ষা অন্যান্য বর্ণের তরঙ্গ সকলকে অধিক পরিমাণে নির্ব্বাণ করে। পার্থিব সমস্ত পদার্থ যখন একমাত্র সূর্য্যের আলোকেই

প্রকাশিত হয়, তখন তাহাদিগের বিভিন্ন বর্ণই সূর্য্যের আলোকমাত্র। সূর্য্যের আলোক যে বিবিধ বর্ণের সমষ্টি, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রকৃতির বিবিধ রাজ্যে আমরা যত প্রকার বর্ণ দেখি, এক সূর্য্যের আলোক বিবিধ রূপে বিশ্লিষ্ট বা মিশ্রিত করিয়া সকলই প্রস্তুত করা যায়।

আলোকের গতি। আলোকের গতি এত দ্রুত যে অনেক দিন পর্য্যন্ত আলোকের প্রচার তাৎক্ষণিক বলিয়া বোধ ছিল; কিন্তু এখন কোন এক পরিমিত স্থান অতিক্রম করিতে আলোকের কত সময় লাগে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দর আবিষ্কার সর্ব্বপ্রথম ঘটে; রোমার (Romer) নামক দিনামার জ্যোতির্ব্বিৎ ইহার আবিষ্কর্ত্তা। এই আবিষ্কারের তথ্য বোধগম্য করিবার চেষ্টা করা যাউক।

সূ সূর্য্যের প্রতিভূ; প ফ ব ভ ম য পৃথিবীর কক্ষ; বৃ বৃহস্পতিগ্রহের স্থান—এই গ্রহ সূর্য্য হইতে পৃথিবীর ব্যবধান অপেক্ষা পাঁচ গুণ দূরে

অর্থাৎ প্রায় ৬০০ নিযুত মাইল দূরে অবস্থিতি করে। যেমন চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে সেই রূপ বৃহস্পতির চন্দ্র বৃহস্পতির চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে; কিন্তু বৃহস্পতির চন্দ্রের বেগ অধিকতর এবং তাহার সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণের সময় অপেক্ষাকৃত অল্প—কেবল ৪২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ও ৩৫ সেকেণ্ড অথবা স্থূলত সাড়ে বেয়াল্লিশ ঘণ্টা লাগে। ঐ উপগ্রহের গ্রাস
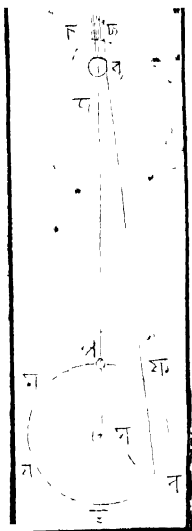
১৯শ চিত্র।

ও পরে মুক্তাবস্থার মধ্যে যে সময় লাগে তাহা দ্বারা আলোকের গতির বেগ নির্ণীত হইয়াছে। যখন উপগ্রহটী বৃহস্পতিগ্রহের ছায়ার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অদৃশ্য হয়, তখন তাহার গ্রাস বলা যায়; যখন উহা ঐ ছায়া হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যালোকলাভে চক্‌চক্‌ করিতে থাকে, তখন তাহার মুক্তাবস্থা। উত্তরায়ণের (summer solstice) কিছু পরে যখন পৃথিবী

আপন কক্ষের ফ বিন্দুতে আসে তখন ঐ উপগ্রহকে একবার মুক্তাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; সেইদিন ও লগ্ন একেবারে ঠিক করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে হয়। ইহার তিন মাস পরে যখন পৃথিবী নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে ব বিন্দুতে আসে তখন আবার এক বার উপগ্রহের মুক্তাবস্থা দেখা যায়। ইহা প্রথম মুক্তাবস্থা হইতে পঞ্চাশত্তম মুক্তাবস্থা; সুতরাং এই শেষ মুক্তাবস্থা ৪২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ডের ৫০ গুণ সময়ে ঘটা উচিত কিন্তু সেই সময়ে উহা ঘটিতে দেখা যায় না—উহা কতক মিনিট বিলম্বে ঘটে, পৃথিবীর অধিক বা অল্প পথ গমনানুসারে ৮ বা ১০ মিনিট বিলম্ব হয়। এই বিলম্বের অন্য কোন কারণ নাই—কেবল উপগ্রহের আলোক ছ হইতে ফ-তে আসা অপেক্ষা ছ হইতে বতে আসিতে অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, এই জন্য ঐ টুকু অধিক বিলম্ব হয় এই মাত্র। এমতে ফ হইতে বতে আসিতে আলোকের যে সময় লাগে তাহা ব্যক্ত হয়। পৃথিবীর কক্ষ সম্বন্ধে ফ ব একটী জ্যা (chord,)

যাহার দৈর্ঘ্য মাইলে জানা আছে। অতএব ইহা হইতে গণনা করিয়া জানা যায় যে এক সেকেণ্ডে আলোক কত দূর যায়। গণনা দ্বারা দেখা যায় যে আলোক এক সেকেণ্ডে ১৯০০০০ মাইল গমন করে। এইরূপ দ্রুতবেগে আলোক প্রচারিত হয়।

এই সিদ্ধান্ত উক্ত বৎসরের দ্বিতীয়ভাগে আরও সপ্রমাণ হয়। দক্ষিণায়নের (winter solstice) কিছু পরে ব বিন্দুতে উপগ্রহের গ্রহণ সন্দর্শন করিয়া যদি তাহার তিন মাস পরে ম বিন্দুতে পুনরায় গ্রহণ দেখা যায় তাহা হইলে পূর্ব্ব গ্রহণ অপেক্ষা এই শেষোক্ত পঞ্চাশত্তম গ্রহণ কিছু শীঘ্র দেখা যায়; ৪২ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ডের ৫০ গুণ বিলম্বের অপেক্ষা করে না, কারণ এবার আলোকের ম য জ্যা কম আসিতে হয়—এই জ্যার দৈর্ঘ্য ফ ব জ্যার দৈর্ঘ্যের ন্যায় গণনা দ্বারা জানা যায়। এই সিদ্ধান্তফল উত্তম উত্তম যন্ত্র সহকারে অনেকানেক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

যদিও পৃথিবীর পৃষ্ঠে ১৯০ মাইল ব্যবধানযুক্ত

এমন দুই স্থান নিরূপণ করা অসম্ভব বলিলেই হয়, যেখান হইতে পরস্পরকে দেখা যাইতে পারে; কিন্তু যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মনোগতিসদৃশ আলোক-গতি এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশ সময়ে উহা উল্লঙ্ঘন করিত। আলোক যদি বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীতে তৎক্ষণাৎ পর্য্যটন করিত, তাহা হইলে উপগ্রহের গ্রাস বা বিসর্জ্জন ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতে পাইতাম। কিন্তু রোমর দেখিলেন যে, যখন বৃহস্পতি হইতে পৃথিবী দূরতম অংশে থাকে, তখন ঐ ঘটনা ১৬ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড বিলম্বে দৃষ্ট হয়। এখন, ১৯শ চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে পৃথিবী যখন সূর্য্যের সমান রেখায় এবং সূর্য্যের যে দিকে বৃহস্পতি সেই দিকে থাকে তখনই পৃথিবী বৃহস্পতির নিকটতম স্থানে থাকে। আর যখন উভয়গ্রহ সূর্য্যের সমরেখায় কিন্তু পরস্পর সূর্য্যের দুই বিপরীত দিকে থাকে তখনি পৃথিবী বৃহস্পতির দূরতম দেশে থাকে। এমতস্থলে এই দূরতম ও নিকটতম স্থানদ্বয়ের ব্যবধান পৃথিবীকক্ষের ব্যাস। এই হেতু রোমর বিতর্ক

করিলেন, আলোকরশ্মির পৃথিবীকক্ষের ব্যাস পার হইতে ১৬ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড লাগে। ইহা হইতে গণনা করা যাইতে পারে, আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৯০০০০ মাইল।

ফিজোর পরীক্ষা।

সাক্ষাৎ পরীক্ষা দ্বারাও আলোকের বেগ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফিজোর যন্ত্র অনায়াসে বোধগম্য হইবে। মনে কর, একটা খাঁজকাটা চাকা আছে, তাহার দুইটী দাঁতের মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া আলোককিরণ প্রেরণ করা গেল। উহার কতক দূরে একটা আয়না আছে। তাহার উপর ঐ আলোক এমতভাবে ফেলা গেল যে উহা প্রতিফলিত হইয়া ঠিক যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই দুই দাঁতের ফাঁক দিয়াই আবার প্রবেশ করিল। এখন যদি ঐ দন্তুর চাকাকে অত্যন্ত বেগে ঘুরান যায় তাহা হইলে ঐ আলোককিরণ আয়না হইতে যখন ফিরিয়া আসিবে, তখন পরবর্ত্তী দাঁতের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া তাহা ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিতে পারে না।

এইরূপ ঘটিবে কি না, তাহা দাঁতের ফাঁকের মধ্য দিয়া আলোককিরণের আয়নাতে যাইবার ও ফিরিয়া আসিবার সময়ের উপর এবং ঐ চাকাকে ঘুরাইবার বেগের উপর নির্ভর করে। ফিজো এমন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন যে তিনি প্রত্যাবৃত্ত আলোক-কিরণকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ দন্তবৎ চক্রের ঘূর্ণনবেগ অবগত থাকাতে তিনি চাকার দাঁতের ফাঁকের মধ্য হইতে আলোককিরণের আয়নায় গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় গণনা করিতে পারিয়াছিলেন এবং এইরূপে তিনি আলোকের বেগ পরিমাণ করিয়াছিলেন।

সূর্য্য হইতে বিভিন্ন গ্রহে আলোক পৌছিতে বিভিন্ন সময় লাগে।

সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে আলোকের ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড লাগে। অতএব ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড পূর্ব্বে সূর্য্য যেখানে ছিল সেইখানে আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

সূর্য্য হইতে আলোককিরণের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহে পৌছিতে ভিন্ন ভিন্ন সময় লাগে। বৃহস্পতিতে যাইতে

৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডের ৫ গুণ সময় লাগে; শনিতে যাইতে ৯০ গুণ এবং ইন্দ্রে (Neptune) যাইতে ৩০ গুণ সময় লাগে।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূর, পৃথিবী হইতে তারাগণের দূরতা তদপেক্ষা দুই লক্ষ গুণেরও অধিক হওয়াতে, সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতম তারা হইতে আমাদিগের নিকট আলোক আসিতে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ডের দুই লক্ষ গুণেরও অধিক, প্রায় সাড়ে চারি বৎসর সময় লাগে।

ইহা অত্যন্ত সম্ভবপর যে, এমন অনেক দৃশ্যমান তারা আছে যাহারা এই ন্যূনকল্প সীমার বহুশতগুণ দূরে অবস্থিত আছে এবং সুতরাং তাহাদিগের আলোক পৃথিবীস্থ দর্শকদিগের গোচর হইতে বহু শতাব্দী কাল অতিবাহিত হয়। এমতে ঐ সকল দূরদূরস্থিত বৃহদায়তন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য পরিবর্ত্তিত, উৎপাতগ্রস্ত বা একেবারে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইতে পারে, তথাপি আমরা পরে বহু শতাব্দপর্য্যন্ত তাহাদিগকে বাস্তবিক বর্ত্তমান বলিয়া গ্রহণ করিব।

সৌরজগতের স্থূলতত্ত্ব।

নিম্নলিখিত তক্তিতে সৌরজগতের স্থূলতত্ত্বগুলি সঙ্কলিত হইল; ইহা প্রাকৃতিক গবেষণাতে অনেক সময় প্রয়োজনে আইসে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের বিষয় এই মাত্র বলিলেই প্রচুর হইবে যে, আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ন্যূনাধিক ৪০০ সংখ্যা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নাম	সূর্য্য হইতে মধ্যম দূরত্ব	প্রদক্ষিণ কাল	ব্যাস (মাইল)	সান্দ্রতা।
বুধ	·৩৯	৮৭ ৯৭ দিন	২৯৯২	১·২১
শুক্র	·৭২	২২৪·৭০ দিন	৭৬৬০	·৮৫
পৃথিবী	১·০০	৩৬৫·২৬ দিন	৭৯১৮	১·০০
মঙ্গল	১·৫২	৬৮৬·৯৮ দিন	৪২১১	·৭৪
বৃহস্পতি	৫·২০	১১·৮৬ বৎসর	৮৬০০০	·২৪
শনি	৯·৫৪	২৯ ৪৬ বৎসর	৭০৫০০	·১৩
বরুণ	১৯·১৮	৮৪·০২ বৎসর	৩১৭০০	·২৩
ইন্দ্র	৩০·০৫	১৬৪·৭৮ বৎসর	৩৪৫০০	·২০

	পৃথিবী হইতে মধ্যম দূরত্ব (মাইল)	ব্যাস (মাইল)	আয়তন	ওজন	অক্ষাবর্ত্তনকাল
চন্দ্র	২৪০০০০০	২১৬০	$\frac{১}{৫০}$	$\frac{১}{৮০}$	২৭$\frac{১}{৩}$
পৃথিবী	—	৭৯১৮	১	১	১
সূর্য্য	৯২০০০০০০	৮৬০০০০	১২০০০০০	৩০০০০০	২৫

সমাপ্ত।

পরিভাষা।

* অধিশ্রয়	focus.
অভিমুখতা	direction.
অনুক্রম তাপ	ordinary heat.
অণু	molecule.
অধ্যাহার্য্য বিষয়	abstraction.
অধ্যাহার্য্য বিজ্ঞান	metaphysics.
* অজনক	hydrogen.
* অরুণক	bromine.
অঞ্জন	antimony.
অসবর্ণ	heterogeneous.
অস্বচ্ছ	opaque.
অসমান	irregular.
অবস্থান	position.
অপ্	water.
আকর্ষণ	attraction.
আণবিক ক্রিয়া	molecular action.
আলক	arsenic.
আকার	shape, form.
আপেক্ষিক	relative.
আয়তন	volume.
আলোক	light.
আন্দোলন	vibration.
ইন্দ্রিয়বোধ	sensation.
* ইন্দ্র (গ্রহবিশেষ)	Neptune.
উপগ্রহ	satellite.

উপধাতু	non-metal.
উত্তাপ বা উষ্ণতা	temperature.
একধাস্পন্দন	single vibration.
ওলন যন্ত্র	plumbline.
কলাই	alloy.
* করকাবিজ্ঞান	crystallography.
কর্ণপটহ	tympanum.
কক্ষরেখা	orbit.
কলঙ্ক	spot.
কঠিন	solid.
কেন্দ্র	pole.
কুজা	flask.
কৃষ্ণায়স	steel.
* ক্রোমক	chromium.
খাড়া	perpendicular.
* খটিক	calcium.
* খটিকা	lime.
গতি	motion.
গন্ধকদ্রাবক	sulphuric acid.
* গন্ধীন	sulphide.
গ্রন্থি	node.
গ্রহ	planet.
গুণ	property.
ঘর্ষণ	friction.
ঘূর্ণিদণ্ড, পাকদণ্ড, ঘূর্ণিকা	screw.
ঘের	circuit.
চক্রবাড়্ দিগ্‌বর্ত্তী বা সমতালবর্ত্তী	horizontal.
চাপ	pressure.

চাক্তি	plate.
চোঙা	cylinder.
চৌম্বক	magnetism.
জড়পদার্থ	inert matter.
জ্যা	chord.
* জীবনবিজ্ঞান	physiology.
ঠাট	mode.
তক্তি	table.
তরঙ্গ	wave.
তন্ত্রী	string.
তরল	liquid.
তাড়িত	electricity.
তাপ	heat.
তাপমান	thermometer.
তাড়িতচৌম্বক	electromagnetism.
তাড়িতস্রোত	electric current.
তীক্ষ্ণতা (শব্দের)	intensity.
তাপাচ্ছ	diathermanous.
তারস্বর	high notes.
তারকা	star.
তৃণমণি	amber.
থাক	layer.
দণ্ড (চোঙার ভিতরে)	piston.
দস্তা বা যশদ	zinc.
* দগ্ধীন	oxide.
* দহক	oxygen.
দন্তুর	toothed.
দিগ্বীক্ষণ বা দিগ্বীন	magnetic compass.

* দীপক	fluorine.
দীপ্তিময়	luminous.
দ্রাবক	acid.
* দৃষ্টিপট	retina.
দৃষ্টিবিদ্যা	optics.
দূরতা	distance.
দৈর্ঘ্য	length.
ধনুক	bow.
ধাতু	metal.
ধারক	insulator.
ধূমকেতু	comet.
নাভিবিন্দু	centre
নারাঙ্গী	orange.
নীল	indigo.
ন্যুব্জদর্পণ	concave mirror.
নেমিদেশ	periphery.
* পত্রক	potassium.
* পত্রিকা	potash.
পরমাণু	atom.
পরিচালক	conductor.
পরিমাণ	magnitude.
পতর	plate.
পিচকিরি	syringe.
প্রতিফলিত	reflected.
প্রভা	brightness.
প্রসার বা প্রসার্য্যতা	range, amplitude.
প্রসারণীশক্তি	expansibility.
পৃষ্ঠ	surface.

প্লবঙ্গ	platinum.
* ফটিক	aluminium.
ফানস	bulb.
* বরুণ	Uranus (গ্রহবিশেষ)
বহ্নি	fire.
বর্ণ	colour.
বল	force.
বসুমৎ	bismuth.
বহ্নিমান	pyrometer.
বারুণী	alcohol.
বাষ্প	vapour.
বাষ্পীয়	gaseous.
বায়ু	air.
ব্যাস	diameter.
বায়ুমণ্ডল	atmosphere.
বিস্তার	expansion.
বিকর্ষণ	repulsion.
বিভাজ্যতা	divisibitity.
বিম্ব	disc.
বিশ্রামরেখা বা সন্ধিরেখা	nodal line.
বেগ	velocity.
বেগুনী	violet.
* বোরক	boron.
ব্যোম, আকাশ বা শূন্য	ether.
ভার	weight, gravity.
ভারবান্	ponderable.
*ভারহীন	imponderable.
ভুবর্লোক	atmosphere.

ভূত	elements.
ভূগোলচৌম্বক	terrestrial magnetism.
* ভৌমক	tellurium.
মধ্যস্থ	medium.
* মরুতক	nitrogen.
* মগ্নক	magnesium.
* মরুতিম	nitrate.
মন্দ (স্পন্দন)	slow.
মন্দ্র (স্বর)	grave notes.
মধ্যম	mean.
মরুৎ পদার্থ	gaseous objects.
মাংসপেশী	muscle.
* মণিচ্ছিদ্র	pupil.
যবক্ষার দ্রাবক বা মরুতদ্রাবক	nitric acid.
যোগানুরাগ	affinity.
যৌগিক বা সঙ্গত	compound.
রঙ্গ	tin.
রচনাপ্রণালী	composition.
রশ্মিময় তাপ বা তাপকিরণ	radiant heat.
রেণু	particle.
রোহিতক	iodine.
রূঢ়িক পদার্থ	element.
লগ্ন	instant.
লাগবাট	armature.
লাটাই	solenoid.
লুব্ধক	Sirius (গ্রহবিশেষ)
লৌহভস্ম	oxide of iron.
শব্দ	sound.

শব্দবিজ্ঞান	acoustics.
শিলিক	silicon.
শোষণ	absorption.
শ্যাম	blue.
শ্রবণ স্নায়ু	auditory nerve.
সঙ্কোচ	contraction.
সর্জ্জ	sodium.
সদৃশ	similar,
সমগোলচাল	spherical.
সমান্তরাল রেখা	parallel lines.
সমতা বা সামঞ্জস্য ধারা	equilibrium.
সর্জিকা	soda.
সান্দ্রতা	density.
সবর্ণ	homogeneous.
সংবৃত	insulated.
সংলগ্নতা	continuity.
সচ্ছিদ্র	porous.
স্পন্দন	vibration.
* সোমক	selenium.
স্নায়ু	nerve.
স্তম্ভযন্ত্র	voltaic pile.
স্বচ্ছ	transparent.
স্বর্লোক	celestial sphere.
স্থায়িত্বভাব	constancy.
স্থিতিস্থাপক	elastic.
স্পন্দচাল	vibrating segment.
স্ফুরক	phosphorus.
হরিৎ	green.

হরিদ্রা	yellow.
* হরিদ্ভীন	chloride.
হরিতক	chlorine.
হিল্লোল	undulation.
ক্ষিতি	earth.
ক্ষারবান্	alkaline.

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা, যোড়াসাঁকো, ৫৫ নম্বর অপার চিৎপুর রোড আদি ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট অথবা ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, যোড়াসাঁকো, ঠিকানায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট প্রাপ্তব্য।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম (সচিত্র) ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। উত্তম কাগজ ও বাঁধাই; মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। ডাঃ মাঃ ৵৹ এক আনা।

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৸৹ বার আনা, মাঃ অর্দ্ধ আনা। ইহাতে হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি পাশ্চাত্য অজ্ঞেয়বাদীদিগের নাস্তিক্যপ্রবণ মত খণ্ডন করিয়া ভারতের সনাতন অধ্যাত্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।

রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৶৹ দুই আনা; মাঃ অর্দ্ধ আনা। কম্বুলিয়াটোলা লাইব্রেরীর কোন বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে পঠিত। ইহাতে ধারাবাহিক ভাবে বেদ অবধি কৃত্তিবাস রামায়ণ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্র কথার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উপসংহারে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র কথার নিবৃত্তি ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকা সমেত) শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদিত। ইহার সুদীর্ঘ ভূমিকাতে গীতার প্রক্ষিপ্ততা সম্যক্ খণ্ডিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি ধর্ম্মমত সুমীমাংসিত হইয়াছে। ইহাতে শ্লোক ধরিয়া একটি সুদীর্ঘ সূচীপত্রও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র; মাঃ ৵০ দুই আনা। সংবাদপত্রাদিতে বিশেষ প্রশংসিত।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ) শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা, মাঃ ⁄০ এক আনা। কলিকাতা রিবিউ প্রভৃতি সকল সংবাদপত্রে একবাক্যে প্রশংসিত।

শতদল—(কবিতা পুস্তক) শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র, ডাঃ মাঃ অৰ্দ্ধ আনা। সংবাদ পত্রাদিতে বিশেষ প্রশংশিত।

ত্রিশূল—(কবিতা পুস্তক) শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র ডাঃ মাঃ অৰ্দ্ধ আনা।

আমিষ ও নিরামিষ আহার—(রন্ধন বিষয়ক নূতন পুস্তক) (যন্ত্রস্থ) শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী প্রণীত।